স্নেহলতা

দ্বিতীয় সংস্করণ

'প্রেমলতা'-রচয়িত্রী প্রণীত।

১৫ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন হইতে

শ্রীরাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশিত

স্নেহলতা

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রস্তাব।

মহানগরী কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বরাহনগর গ্রামে, জাহ্নবীতটস্থ একটী উচ্চ প্রাসাদের ছাদের উপর, ফুল্লকমলতুল্য একটী বালিকা, জাহ্নবীর তরঙ্গমালা-পরিশোভিত মধুর মূর্ত্তি অনিমিষ নয়নে অবলোকন করিতেছে। সান্ধ্য সমীরণ, নিম্নস্থ পুষ্পোদ্যান হইতে সুগন্ধ বহন করিয়া, বালিকার কুঞ্চিত-কেশরাশি লইয়া খেলা করিতেছে। পূর্ণিমার নবোদিত চন্দ্রমা আপনার শুভ্র সুধাময় কিরণরাশি বালিকার বিমল শরীরে ঢালিয়া দিতেছে। বালি[illegible] [illegible]স্নিগ্ধ, সুধাময় বর্ণ সুধাকরের জ্যোৎস্নার সহিত মিশিয়া [illegible]তেছে। বালিকার বয়স ষোড়শ বৎসরের অধিক হয় নাই। [illegible]ন্তু, এই বয়সেই বালিকার সুবঙ্কিম সুন্দর ললাটে দুই একটী চিন্তা-[illegible] স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। বালিকার কুসুমতুল্য বদনখানি মেঘাবৃত [illegible] ন্যায় বোধ হইতেছে [illegible]।

জাহ্নবী দেবী, তরঙ্গায়িত বিশাল বক্ষে সুধাকরের সুস্নিগ্ধ কিরণরাশি পতিত হওয়ায়, আনন্দে স্ফীত হইয়া, নৃত্য করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছেন। জ্যোৎস্নাময়ী নদী-সুন্দরী আজ কত ভাবুকের প্রাণে কত প্রকার ভাবরাশির উদয় করিয়া দিতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী বালিকা, নদী আজ তোমার হৃদয়-উদ্যানে কি ভাবের উদয় করিয়া দিতেছে?

বালিকা গঙ্গার এই বিমোহন অতুল শোভা দেখিতেছেন, এমন সময় স্নেহমাখা স্বরে পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, "স্নেহ! এখনও এখানে একলাটী বসিয়া কি করিতেছ?"

স্নেহ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রিয়-সহচরী ভ্রাতৃজায়া ঊষাবতী আসিয়াছেন। বালিকা মেঘোন্মুক্ত শশীর ন্যায় প্রফুল্ল বদনে দুই বাহুর দ্বারা ঊষাবতীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া কহিলেন, "বৌ ঠাক্‌রুণ, তুমি আসিতে এত দেরী করিলে কেন? কি করিতেছিলে!"

ঊষা। তোমার দাদা এমন এক কথা তুলিয়াছিলেন যে, সে কথার প্রলোভন ছাড়িয়া কিছুতেই আর উঠিতে পারিতেছিলাম না। কথাটা আমারও এত মিষ্ট লাগিতেছিল যে, শীঘ্র শেষ করিতে কোন মতেই ইচ্ছা হইতেছিল না।

স্নেহ আগ্রহের সহিত বলিলেন, "কি কথা হইতেছিল? বল না, বৌ ঠাক্‌রুণ! তোমাদের খুব ভাল-ভাল কথার সময় বুঝি আমায় ডাকিতে নাই?"

ঊষা একটু হাসিয়া কহিলেন, "শুনিবে, কি কথা কহিতেছিলাম? তোমার বিয়ের দিন তোমাকে কেমন দেখাইবে, তুমি কি করিবে,

অমৃত বাবু বর সাজিয়া আসিলে তাঁহাকে কেমন দেখাইবে, কি কি তামাসা, কি কি আমোদ করা যাইবে—এই সব নানা রকম কথা হইতেছিল। এই সকল কথা শুনিলে, তুমি লজ্জাবতী লতার ন্যায় মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইতে। তোমায় ডাকিয়া আর কি করিব? এই সব কথা শুনিতে তো তুমি ভালবাস না।—এখন চল্, তোর ছবি দেখাইবি। তুই বড় দুষ্ট হইয়াছিস্। কাল তোর ছবি আসিয়াছে, আর আমায় দেখাস্ নাই। তুই দিন দিন যেন কি হইয়া যাইতেছিস্। তোর আর সে হাসি নাই, সে গান নাই—সদাই একলা একলা থাকিতে ভালবাসিস্। অমন দুষ্টামি করিলে আমি আর তোর সঙ্গে কথা কহিব না।"

স্নেহ। রাত-দিন আমার মুখ দেখিতেছ, তবু সাধ মিটে না? ছবি দেখাই নাই বলিয়া আমায় এতগুলি কথা বলিলে? আমি দাদার কাছে বলিয়া দিব।

ঊষা। আচ্ছা, বলিয়া দিস্—এখন চল্, তোর ছবি দেখাইবি।

এই বলিয়া স্নেহলতার হস্তধারণ পূর্ব্বক উভয়ে প্রস্থান করিলেন। স্নেহ অগত্যা স্বীয় কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক ছবি দেখাইতে লাগিলেন। উভয়ে ছবির দোষ-গুণ-বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় পার্শ্বস্থ কক্ষে দুই জনের কথোপকথন তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। দুই জনের মধ্যে একজন পুরুষ—অপরা রমণী।

রমণী ধীরে ধীরে কহিলেন, "দেখ অমন সোনার চাঁদ ছেলে ছাড়িও না। এমন সর্ব্বগুণসম্পন্ন পাত্র মিলা ভার। অমৃতলালের ন্যায় সর্ব্বগুণান্বিত পাত্র দেখা যায় না। যেমন কার্ত্তিকের মত রূপ তেমনই

গুণ! বাছার গুণের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। হইবে না কেন? এই বয়সে তিন-চারিটা পাশ দিয়াছে!

পুরুষ। তা তুমি যতই কেন বল না, আমি কখনই সেই কুলহীনের সহিত বিবাহ দিব না। তুমি কি করিয়া বল? আমার কন্যা তাকে দিব? ছোঁড়া ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া জাত-মানের বিচার করে না। গুণ তো ভারি! এক গুণের মধ্যে দেখি, ছোট লোকের ঘরে রোগীর পাশে দিন-রাত পড়িয়া থাকে। ছোঁড়ার একটু ভদ্রাভদ্র জ্ঞান নাই। সেদিন রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে দেখি—রাস্তার পাশে একটা মুচির কুঁড়ে ঘরের ভিতর বসিয়া, মুচি-বেটার মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিতেছে। শেষে সেই দিন আপনিই বলিল, সেই বেটার ওলাউঠা হইয়াছিল। আমি তো শুনিয়া একেবারে শিহরিয়া উঠিলাম! কতগুলা পাশ করিয়াছে কিনা, তাহা দেখিবার আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তাহার বিদ্যা আছে, সে বিদ্যাতে আমার কোন আবশ্যক নাই।

রমণী দুঃখমিশ্রিত ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "ভিক্ষুক বহুমূল্য হীরককে কাঁচ মনে করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? আহা! এমন অন্যায় কাজ করিতে তুমি তাহাকে দেখিয়াছিলে! বাছার আমার ঐ গুণেই তো সকলে মোহিত। অমন হীরের টুক্‌রা ছেলে তোমার পছন্দ হইবে কেন? তা' তুমি যাহাই কেন বল না, তুমি মনে করিও না যে,—আমি আমার সোনার চাঁদ স্নেহকে অপদার্থ কুলসর্ব্বস্ব কুলীনের হাতে দিয়া, বাছার আমার চিরসুখে জলাঞ্জলি দিব।"

পুরুষ ক্রোধমিশ্রিত স্বরে কহিলেন, "আমি কখনই কুল-মানে জলাঞ্জলি দিয়া কন্যার বিবাহ দিব না।"

রমণী নম্রস্বরে কহিলেন, "তোমার পায় পড়ি, আর গোল করিও না, অস্বীকার করিও না। দাদার এই পাত্র অত্যন্ত মনোনীত হইয়াছে। আর আমার স্নেহের ভাব-গতিক দেখিয়া বোধ হয়, সেও অমৃতলালকে পছন্দ করিয়াছে। কিন্তু, তোমার ভাব দেখিয়া বাছার আমার আর সে প্রফুল্লতা নাই। যে আমাকে দেখিবামাত্র 'মা' বলিয়া কত সোহাগ জানাইত, সে এক্ষণে আমার চক্ষের অন্তরে নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসে। আমার দুধের মেয়ে স্নেহ এখন গম্ভীর হইয়াছে। সে হাসিমাখা মুখে আর সে হাসি নাই। আহা! বাছার আমার অমন সোনার বর্ণ কালী হইয়া যাইতেছে। তোমার কি তাহার মুখ দেখিয়া একটু'ও কষ্ট হয় না?"

বলিতে বলিতে রমণীর কণ্ঠরোধ হইল। বোধ হইল, রমণী কাঁদিতেছেন।

পুরুষ। তোমার দাদার এইরূপ পাত্র পছন্দ না হইবে কেন? তিনি যেমন, তাঁর পছন্দও তেমনই। তাঁর পছন্দ অপছন্দে আমার কোন আবশ্যক নাই। হুঁ, তখনই বলিয়াছিলাম—মেয়েকে লেখা-পড়া শিখাইবার আবশ্যক নাই। কন্যা আমার চাক্‌রী করিয়া খাওয়াইবে না। হিন্দুর মেয়ের আবার লেখা-পড়ার প্রয়োজন কি? এখন দেখ, কি ভয়ানক কথা—হিন্দুর মেয়ে হইয়া কি না ইচ্ছামত বিবাহ করিতে চাহে! দুর্গা! দুর্গা! আমার জাতি, কুল, মান, সব গেল! তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি কখনই অমৃতের সহিত স্নেহের বিবাহ দিব না। তুমি আর আমাকে এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিও না।

রমণী তেজের সহিত বলিতে লাগিলেন, "স্নেহ আমার ও তোমার উভয়েরই স্নেহের প্রত্যাশিনী। তাহার উপর যখন তোমার বিন্দুমাত্র মায়া নাই, তখন আমার স্নেহ তোমার কিছুরই প্রত্যাশা করে না। আমিই আমার স্নেহকে মনোমত পাত্রে অর্পণ করিব।"

রমণীর এই কথা শেষ হইতে না হইতে, পুরুষ আঘাতপ্রাপ্ত সর্পের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া, ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিতে লাগিলেন, "তোমার কন্যা লইয়া তুমি থাক—আমার সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নাই! আমি এ জন্মের মত চলিলাম।" এই বলিয়া বেগে গৃহ হইতে বহিস্কৃত হইলেন।

পাঠক মহাশয় ইঁহাদের পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকিবেন। ইঁহারা আমাদের পূর্ব্ব-বর্ণিতা স্নেহলতার জনক-জননী।

স্নেহলতা ও উষাবতী এতক্ষণ নীরবে এই সকল বাক্য-পরম্পরা শুনিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে স্নেহলতার সেই আয়ত, নীলোৎপল-চক্ষু দুটী অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। উষাবতী সযত্নে স্নেহের অশ্রু মুছাইয়া কহিলেন, "ছি, দিদি, ওকি তুমি কাঁদ কেন?"

স্নেহলতা কিছুক্ষণ পরে কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "ভাই বৌঠাকরুণ! আমার বড়ই লজ্জা করে। এঁরা এই সামান্য বিষয় লইয়া এত বিবাদ করেন কেন? আমি বাবার মুখেই তো শুনিয়াছি যে, তাঁহাদের দেশে এমন অনেক কুলীনের মেয়ে আছেন, যাঁহারা চিরকাল কুমারী থাকিয়া দিন যাপন করেন। আমিও চিরদিন তাঁদের সেবা করিয়া সুখে দিন কাটাইব।"

বুদ্ধিমতী উষাবতী স্নেহের সুন্দর হাতখানি আপন হাতে লইয়া

কহিলেন, "স্নেহ, দেখ কেমন সুন্দর জ্যোৎস্না হইয়াছে! চল, আমরা বাগান হইতে বড় বড় বেল ও গোলাপগুলি তুলিয়া আনি। তোমার দাদাকে যে আজ মালা গাঁথিয়া দিবে বলিয়াছিলে?"

স্নেহলতা অগত্যা অনিচ্ছাপূর্ব্বক উষাবতীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

উষা বড় আমোদিনী। কাহারও ম্লান মুখ দেখিতে পারেন না। নানা প্রকার হাস্যামোদ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই স্নেহকে হাসাইলেন, কিন্তু এ হাসি বাহিরের।

আমরা এই অবসরে পাঠক-পাঠিকাদিগকে এই ললনাদ্বয়ের কিছু পরিচয় দিই। স্নেহলতা কুলীন কন্যা—মাতামহের আলয়ে প্রতি-পালিতা। স্নেহলতার মাতামহের নাম—রামদাস রায়। ইনি একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার ছিলেন। ইঁহার তিনটী সন্তান—এক পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রটীর নাম—চুনিলাল। জ্যেষ্ঠা কন্যাটীর—নাম শ্যামাসুন্দরী, কনিষ্ঠার নাম—হরসুন্দরী। রামদাস মহাশয় কুলমর্য্যাদা বৃদ্ধির নিমিত্ত জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্যামাকে উচ্চ কুলীনের হাতে অর্পণ করেন। শ্যামাসুন্দরীর স্বামী যদুনাথ বন্দোপাধ্যায়, বিবাহ করিয়া অবধি, রামদাস মহাশয়ের বাড়ীতেই ঘর-জামাই রূপে অবস্থান করেন। ইঁহার বাড়ী বিক্রমপুর। রামদাস মহাশয় দ্বিতীয়া কন্যা হরসুন্দরীকে অবিবাহিত অবস্থায় রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে চুনি-লাল তাঁহার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইলেন। চুনিলাল অতি সদাশয়, উদার প্রকৃতির লোক। অর্থই অনেক সময় ধনী-পুত্রের অনর্থের মূল হয়; কিন্তু, চুনিলাল সেরূপ প্রকৃতির লোক নহেন। বৃদ্ধ রামদাস মহাশয়ের চরণতলে বসিয়া অতি উৎকৃষ্ট শিক্ষা

লাভ করিয়াছেন। পিতার সম্পত্তি অতি সাবধানে নানা প্রকার সদ্ব্যয় করিয়া, পিতার সুকৃতি বিস্তার করিতেছেন। তিনি আপন কনিষ্ঠাদ্বয়কে নিরতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি হরসুন্দরীকে সৎপাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে হরসুন্দরীর সুন্দর একটী পুত্র হয়। পুত্রটীর বয়স যখন দুই বৎসর, সেই সময় হঠাৎ হরসুন্দরী অকালে কালগ্রাসে পতিতা হন। শ্যামা পুত্রটীকে রাখিবার জন্য অনেক যত্ন করেন; কিন্তু পুত্রের পিতা অক্ষয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় কোন মতেই স্বীকৃত হইলেন না। তিনি পুত্রটীকে আপনার নিকট রাখিয়া, অতি যত্নে লালন-পালন করিতে লাগিলেন ও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাভ্যাস করাইতে লাগিলেন। বালকটীর নাম—সুশীলকুমার।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্যামাসুন্দরী তাঁহার পিতৃগৃহেই অবস্থিতি করেন। তাঁহারই এই একমাত্র কন্যা—স্নেহলতা।

চুনিলালের একটী মাত্র পুত্র—নাম হীরালাল। হীরালাল পিতার উপযুক্ত পুত্র। জগতের যেন সমুদায় সদ্‌গুণেই হীরালাল শোভিত। হীরালাল অতি অল্প বয়সেই অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রতিভাপ্রভাবে নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। চুনিলাল হীরালালের উপযুক্ত সময়ে বিবাহ দিয়া, পরমসুন্দরী নানাসদ্‌গুণসম্পন্না পুত্রবধূ গৃহে আনিয়া, গৃহ উজ্জ্বল করিয়াছেন। চুনিলালের গৃহে সর্ব্বদাই সুখ-শান্তি বিরাজিত। চুনিলালের এই পুত্রবধূই আমাদের পূর্ব্ব-বর্ণিতা উষাবতী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—*—

বিদায়।

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। স্নেহলতা তাঁহার সুসজ্জিত-কক্ষমধ্যে বাতায়ন-সন্নিধানে একাকী একখানি চৌকির উপর বসিয়া আছেন। উন্মুক্ত গবাক্ষ হইতে চন্দ্রকিরণ আসিয়া তাঁহার কুসুমসদৃশ বদন-মণ্ডল চুম্বন করিতেছে। মৃদু সান্ধ্য সমীরণ, নিম্নস্থ জাহ্নবী-সলিল স্পর্শ করিয়া, গৃহ-মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। মাঝিরা উচ্চ কণ্ঠে সারি গাহিতে গাহিতে, সুন্দর-সুন্দর তরণীগুলি ঝপ্ ঝপ্ শব্দে বাহিয়া চলিয়াছে। নিম্নস্থ রাজপথ দিয়া কত লোক আসিতেছে—যাইতেছে। কেহ হাসি-তেছে, কেহ গাহিতেছে। সকলেই যেন কোন এক গুপ্ত উদ্দেশ্যে জগতময় পরিচালিত হইতেছে। বুঝে না, জানে না, তবু জগতের কাজ করিয়া সুখী হইতেছে। স্নেহলতা একাগ্রমনে পৃথিবীর এই সকল অভিনব ভাব দেখিতেছেন, এমন সময়ে একটী যুবা সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। স্নেহ তাহা দেখিতে পাইলেন না। যুবা দেখিলেন, স্নেহ ম্লান বদনে কি যেন ভাবিতেছেন। স্নেহের সেই সুকুমার বদনখানি মলিন ও চিন্তাযুক্ত বোধ হইতেছে। যুবা ধীরে ধীরে ডাকিলেন, "স্নেহ!"

স্নেহ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন—অমৃতলাল। তাঁহার হৃদয়ে মুহূর্তের জন্য কি যেন একটু অব্যক্ত সুখের বিদ্যুৎ খেলিল, মুহূর্তের

জন্য আনন্দরাশি হৃদয়খানি অধিকার করিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে বড় বড় চক্ষুদুটীর সহিত সুন্দর বদনখানি, লজ্জাবতী লতার ন্যায়, অবনত হইয়া পড়িল।

অমৃতলাল কহিলেন, "স্নেহ, আজ আমি বাড়ী যাইব, তাই তোমাদের কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

কথার প্রত্যুত্তর না পাইয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "স্নেহ! আমি তবে যাই!"

স্নেহ এবারেও কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার হৃদয়ের পূর্ব্ব-সুখরাশি অন্তর্হিত হইয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার কোমল হৃদয় যেন কোন এক অসহ্য মর্ম্মভেদী যাতনা অনুভব করিতেছে।

অমৃতলাল এবার ব্যাকুল ভাবে কহিলেন "স্নেহ! বিদায় দেও।"

স্নেহ এবার ধীরে ধীরে অমৃতলালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। পুনরায় অবনতমুখী হইয়া আপন বস্ত্রাঞ্চল খুঁটিতে লাগিলেন। স্নেহ যেরূপ ভাবে অমৃতলালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, সেরূপ মর্ম্মভেদী দৃষ্টি অমৃতলাল আর কখন দেখেন নাই। তাঁহার হৃদয় যেন কি একটা অসহ্য যাতনা পাইল। তিনি নিকটস্থ একখানি চৌকিতে বসিয়া পড়িলেন এবং ধীরে ধীরে কহিলেন, "স্নেহ! আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি?"

স্নেহ এবার উত্তর না দিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, বীণানিন্দিত স্বরে কহিলেন, "আপনি অপরাধ করিবেন!" কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, স্নেহ নীরব হইলেন।

অমৃতলাল যে স্বর শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইতেছিলেন, এতক্ষণ

পরে সেই সুধামাখা স্বর শুনিলেন। তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার কথঞ্চিৎ দূর হইল। তিনি কহিলেন, "স্নেহ! আজ তোমাকে এত ম্লান দেখিতেছি কেন? এক সপ্তাহ হইল, আমি এখানে আসি নাই। এই অল্প সময়ের মধ্যে তোমার সকলি যেন কেমন নূতন নূতন দেখিতেছি। ইহার কারণ বলিয়া আমার সংশয় দূর কর। বল, তোমার এই আকস্মিক ভাবান্তরের কারণ কি?"

স্নেহ মৃদু শুষ্ক হাস্য করিয়া কহিলেন, "ভাবান্তর কি?"

অমৃতলাল পুনর্ব্বার কহিলেন, "স্নেহ! আজ আমি আমার জীবনের শুভাশুভের বিষয় তোমার মুখে শুনিব। আমি বড় আশা করিয়া আসিয়াছি, স্পষ্ট বলিয়া আমায় সুখী করিবে না কি?"

স্নেহের বদনমণ্ডল ঈষৎ রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল। তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত স্থানে আবার কি একটা ভাব খেলিয়া গেল। তিনি মৃদুস্বরে কহিলেন, "জানি না, কি বলিব।" কথাটা আবারও কেমন ভার-ভার হইয়া আসিল।

অমৃত। আমার প্রাণের কথা কিছু কি তোমার জানিতে বাকি আছে? যদি থাকে বল, প্রাণ খুলিয়া সব বলি। কিন্তু জানি না, কোন্ অপরাধে আজ পর্য্যন্ত তোমার হৃদয়ের কোন কথাই জানিতে পারিলাম না। অপরাধ লইও না, সাহস পাইয়াছি, তাই ক্ষুদ্র হইয়াও তোমার মনোভাব জানিতে চাই। স্নেহ, আজ বড় ইচ্ছা হইতেছে— তোমার মুখে শুনিব, তোমার পবিত্র ভালবাসার কিছুমাত্র অধিকারী হইয়াছি কি না?

স্নেহ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অমৃতলালের ঔৎসুক্যপূর্ণ

বদনের প্রতি একবার দৃষ্টি করিলেন। সেই নিশ্বাস ও সেই করুণ দৃষ্টি অমৃতলালের হৃদয় ভেদ করিল। তিনি আবার ব্যাকুল ভাবে কহিলেন, "স্নেহ! উত্তর দাও।"

স্নেহ। আপনাকে আমি কি বলিব? আপনি জানুন, আমি আপনার পবিত্র প্রেমের প্রতিদান করিতে পারি নাই। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ভুলিয়া যান—এই আমার আপনার কাছে একমাত্র প্রার্থনা।

অমৃতলালের মস্তকে যেন সহসা অশনিপাত হইল। তিনি স্নেহলতার কথার কি প্রত্যুত্তর করিবেন, ঠিক করিতে পারিলেন না।

স্নেহ পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, "আমি আপনার অকৃত্রিম ভালবাসার প্রতিদান করিতে পারি নাই। আমার ভালবাসায় আপনি কদাচ সুখী হইতে পারিবেন না। যে ভাগ্যবতী আপনার অকৃত্রিম পবিত্র প্রেমের প্রতিদান করিয়া কৃতার্থ হইবেন, আপনি তাঁহাকে আপনার এই নির্ম্মল, পবিত্র প্রেম দান করিয়া সুখী হউন এবং এই অভাগিকে সুখী করুন।"

অল্পভাষিণী স্নেহ কখনও অমৃতলালের সহিত এরূপ ভাবে কথা বলেন নাই। হৃদয়ের আবেগে তিনি আবার কহিতে লাগিলেন. "যখন জানিব, আমার ভাবনা হইতে আপনি মুক্ত হইয়াছেন, তখনই আমি এ সংসারে সুখী হইতে পারিব।"

বলিতে বলিতে তাঁহার আকর্ণলোচনদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। বালিকা বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা মুখ আবৃত করিলেন।

অমৃতলাল এই হৃদয়ভেদী পরিবর্ত্তনের কারণ কিছু মাত্র অনুভব

করিতে পারিলেন না। তিনি শূন্য হৃদয়ে অধীর ভাবে কহিলেন, "স্নেহ! আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি?"

স্নেহ চেষ্টা করিয়াও কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া আসিল।

অমৃতলাল পুনর্ব্বার কাতর চিত্তে কহিলেন, "স্নেহ! তুমি কি জান না, তোমার এক ফোঁটা চক্ষের জল আমার হৃদয়ের রক্ত? স্নেহ, বল—কেন কাঁদিতেছ? আর আমায় অন্ধকারে রাখিও না।"

অমৃতলাল প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষায় স্নেহের লাবণ্যময় মুখখানির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাঁহারও আয়তনয়নদ্বয় শুষ্ক রহিল না। কিছুক্ষণ পরে স্নেহ বদনাবরণ উন্মোচন করিলেন। অমৃতলাল মোহিত হইলেন। তিনি অনিমেষ নয়নে তাঁহার সুধাংশু-বদনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিলেন, "স্নেহের আমার রোদনেও অপূর্ব্ব শোভা!" স্নেহলতার আরক্তিম নয়নদ্বয় সলিলসিক্ত কমলের ন্যায় বোধ হইতেছে; তাঁহার নিবিড়-কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কেশরাশি আলুলায়িত রূপে ঘুরিয়া ফিরিয়া বক্ষে ও পৃষ্ঠে ছড়াইয়া রহিয়াছে। তাঁহার নয়নদ্বয় অবনত, শরীর স্পন্দহীন, ওষ্ঠাধর মুদ্রিত; উহা কেবল এক একবার সুন্দর দন্ত দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে।

অমৃতলাল বিমুগ্ধ চিত্তে কহিলেন, "স্নেহ, বল—এই রূপ যাতনা দিতেছ কেন?"

স্নেহ কেন রোদন করিয়াছেন, কি বলিবেন? রোদন করিয়াছেন বলিয়া লজ্জিত হইয়াছেন। এবারেও অমৃতলালের কথার উত্তর দিতে পারিলেন না।

অমৃতলাল পুনরপি কহিলেন, "স্নেহ! তুমি কি অনুভব করিতে পারিতেছ না, আমার কি অসহ্য যাতনা হইতেছে?—বল, কেন কাঁদিতেছ?"

স্নেহ। বলিব, আজ আপনাকে সকলি বলিব। কিন্তু আমার একটী প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে। আপনি বলুন, আমার আশা ত্যাগ করিয়া আমায় সুখী করিবেন?

অমৃত। কি বলিতেছ, স্নেহ? তোমার কথাতো আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার আশা ত্যাগ করিব? যাহার ভাবনা ভাবিয়া অতুল সুখ অনুভব করি, যাহার ভাবনায় আমি দুঃখে শান্তি পাই, তাহার ভাবনা ত্যাগ করিয়া আমি কি লইয়া থাকিব? স্নেহ, তুমি এমন নির্দ্দয় হইলে কেন? কেন তুমি বার বার আমায় এমন অসহ্য কষ্ট দিতেছ? শীঘ্র সমুদয় খুলিয়া বল। তুমি বুঝিতেছ না, তোমার এই কষ্টের অংশী হইবার জন্য আমার প্রাণ কতদূর ব্যাকুল হইতেছে।

স্নেহ। আপনার এই স্নেহই তো,—এই অমূল্য ভালবাসাই তো আমার দুঃখের মূল। এই ভালবাসা বিস্মৃত হউন, আমায় রক্ষা করুন!

বলিতে বলিতে আবার সেই বড় বড় চক্ষুদুটী অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমল হস্ত দুইখানি দিয়া তাহা মুছিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তাঁহাদের পরিণয় সম্বন্ধে তাঁহার পিতার মত জানাইলেন। অমৃতলাল সমুদায় শুনিয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। পরে নীরবতা ভেদ করিয়া অমৃতলাল কহিলেন, "কেন,

স্নেহ, তোমার মাতার তো ইচ্ছা আছে। তবে আমি নিরাশ হইব কেন?"

যদিও এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্নেহলতার জন্ম, এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে তিনি শিক্ষিতা, কিন্তু—দুর্ভাগ্যই বল আর সৌভাগ্যই বল— স্নেহলতা সেরূপ শিক্ষা পান নাই, যাহাতে পিতৃমাতৃভক্তি হইতে তাঁহাকে দূরে ফেলিবে। তিনি আপনাকে পিতা-মাতার অধিকার-ভুক্তা বলিয়া মনে করেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আত্মীয়, বন্ধু, জগতের সকলের যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা অর্পণের নিমিত্ত তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি সদাই উন্মুক্ত। তাই, অমৃতলালের কথায় স্নেহ দুঃখিত হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মৃদু শুষ্ক হাস্য করিয়া কহিলেন, "মা'র খুব ইচ্ছা আছে সত্য, কিন্তু আপনি কি মনে করেন—বাবার মনে কষ্ট দিতে, তাঁহাকে অবমাননা করিতে আমার ইচ্ছা হইবে? আর আপনি কি জানেন না, হিন্দুরমণীগণের স্বামীই একমাত্র দেবতা। স্বামী সহস্র দোষে দোষী হইলেও সর্ব্বদা তাঁহাদের চিত্ত সেই স্বামীপদেই ন্যস্ত থাকে। তাঁহারা স্বামীর আজ্ঞা পালন করিয়া কৃতার্থ হন। স্বামীর বদন ম্লান দেখিলে তাঁহাদের হৃদয়ে যেন বজ্রপাত হয়, স্বামীর বদন প্রফুল্ল দেখিলে তাঁহারা স্বর্গসুখ অনুভব করেন। বাবা বাড়ী যাওয়া অবধি মা'র মনে কি সুখ আছে? তাই, আবার বলিতেছি, আপনি আমায় আপনার পবিত্র হৃদয় হইতে বিদায় দিন।"

অমৃতলাল শূন্য হৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন, "না—না, তাহা কখনই হইবে না! স্নেহ, আর আমাকে অমন নির্দ্দয় কথা বলিও না। আমি তোমার

পিতার চরণ ধরিয়া কাঁদিব, বিনয় করিয়া বলিব। তাহা হইলে অবশ্যই এ অভাগার প্রতি তাঁহার দয়া হইবে।"

আবার স্নেহলতার সেই আরক্তিম গণ্ড বাহিয়া, ধীরে ধীরে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। স্নেহ ধীরে ধীরে কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "অমৃত বাবু, এই পবিত্র ভালবাসায় পৃথিবীতে এমন কিছু নাই, যাহা অসাধ্য হইয়া থাকে। আপনি আমার আশা ত্যাগ করুন। আপনি বীর—আমি ক্ষুদ্র বালিকা, আমি আর আপনাকে কি বলিব? আপনি তো আমার সুখের জন্য সকলি করিতে পারেন। তাই বলিতেছি, আমাকে ইহজন্মের মত ভুলিয়া যান। যখন জানিব, আমার ভাবনা আর আপনাকে ক্লেশ দিতেছে না, তখনই জানিবেন, আমি এ জগতে সুখী হইব। নিশ্চয় জানিবেন, বাবা এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।"

অমৃতলালের ধীর হৃদয় আজ ক্ষুদ্র বালিকার নিকট পরাস্ত হইল। তিনি অধীর হইয়া কহিলেন, "ছিঃ স্নেহ, অমন নির্দ্দয় কথা বলিয়া আর আমাকে অসহ্য যাতনা দিও না। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি—জীবনে মরণে চিরদিন তোমাকে হৃদয়ের দেবী করিয়া রাখিব। তুমি ভিন্ন আর কেহই এ হৃদয়ে স্থান পাইবে না। তুমিই যে এই দুঃখময় সংসারে আমার এক মাত্র আরাম! তুমি ব্যতীত তিষ্ঠিব কিরূপে?"

অমৃতলাল হতজ্ঞান হইয়া এই সকল কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে বাহিরে কে তাঁহাকে ডাকিল। তখন তাঁহার স্মরণ হইল যে, আজ তিনি বাড়ী যাইবেন। তিনি স্নেহের প্রতি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত

করিয়া কহিলেন, "স্নেহ! বিদায় দাও। আশা করি তোমার পুনর্দ্দর্শনে সফলমনোরথ হইব, বিশেষ আবশ্যক না থাকিলে বাড়ী যাইতাম না।"

স্নেহ কি উত্তর দিবেন? অমৃতলালের সকল কথা শুনিয়াছেন কি না সন্দেহ। তাঁহার মন অমৃতলালের অসামান্য নিষ্কলঙ্ক প্রেমে অভিভূত ছিল। ইতিমধ্যে হীরালাল উষাবতী সহ সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অমৃতলাল দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। হীরালাল ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "আজ আর, ভাই, তোমার বাড়ী যাওয়া হইল না। আজ এই খানেই থাক, কলিকাতা গিয়া বোধ হয় ট্রেন পাইবে না।"

অমৃত। রাত্রি কত হইয়াছে?

হীরালাল। আটটা।

অমৃত। তবে নিশ্চয়ই পাইব, আমার গাড়ী কি রাস্তায় আছে?

হীরালাল। আছে।

অমৃত ঈষৎ হাস্য করিয়া উষাবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "তবে আজ যাই।"

উষাবতী হাস্য বদনে কহিলেন, "আমি তোমায় বিদায় দিবার কে? স্নেহের নিকট বিদায় লইয়া যাও।"

অমৃতলাল স্নেহের প্রতি সস্নেহদৃষ্টিতে কহিলেন, "আজ যাই।" তৎপরে উষার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "আপনারা অনুগ্রহ করিয়া পত্রাদি লিখিবেন।"

উষা। লিখিব, শীঘ্র আসিবে তো?

অমৃতলাল, "শীঘ্রই আসিব" এই বলিয়া হীরালালের সহিত ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎ দূর গিয়া অমৃতলাল পশ্চাৎ ফিরিয়া কি দেখিলেন? দেখিলেন—স্নেহলতা লতার ন্যায় উষাবতীর গলদেশ ধারণ করিয়া তাঁহারই প্রতি অশ্রুপূর্ণ লোচনে চাহিয়া রহিয়াছেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, "স্নেহ! তোমার ন্যায় অমিয়-মাখা চরিত্র কি ভূলোকে মিলে? আমি তোমার আশা ছাড়িব? জীবন থাকিতে নহে।"

স্নেহের নিকট হৃদয়টী রাখিয়া অমৃতলাল চলিয়া গেলেন। এই সময় পাঠক মহাশয়কে অমৃতলালের কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। অমৃতলালের পিতা এক সময়ে একজন ধনবান্ লোক ছিলেন। ইঁহার পৈত্রিক বাসস্থান কলিকাতার সন্নিকট বেলঘরিয়া নামক গ্রামে। ইঁহার পিতার নাম—পশুপতি চক্রবর্ত্তী। চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে এই পৃথিবীর মনুষ্য না বলিলেও চলে। ইনি অতিশয় নিরীহ, শিষ্টাচারী লোক। ইঁহাকে নিতান্ত ভাল মানুষ পাইয়া দুষ্ট লোকে ইঁহার প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিল, এবং অল্প কালের মধ্যেই ইঁহার ধন-সম্পত্তি ঠকাইয়া লইল। এই প্রকারে তাঁহাকে ঠকাইয়াও দুরাচারেরা ক্ষান্ত হইল না। এই সাধু ভদ্র লোকের প্রতি নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই দুর্ব্বৃত্তগণের অত্যাচার আর সহ্য করিতে পারিলেন না। অবশিষ্ট যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল তাহা লইয়া সপরিবারে স্বদেশ ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই একটী অল্পবয়স্ক বালক ও একটী এক বৎসরের কন্যা লইয়া সপরিবারে

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বালকটীকে সেই স্থানেই যত্ন পূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস করাইতে লাগিলেন। বালক অপরিসীম মেধা ও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-প্রভাবে অতি সুন্দর শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণের মনে যৎপরোনাস্তি আনন্দ হইতে লাগিল। তিনি কিছু দিন পরে বালককে উচ্চ-শিক্ষালাভার্থ মহানগরী কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন। বালক দিন দিন নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে লাগিল ও নানা সদ্‌গুণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া উঠিল। সেই বালকই আমাদের এই চতুর্ব্বিংশতিবর্ষবয়স্ক যুবা অমৃতলাল। অমৃতলাল ও হীরালাল কলিকাতার এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন, —এই হেতু ইঁহাদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুতা জন্মে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এ রমণী কে ?

মৃজাপুরের একটী সুন্দর অট্টালিকার একটী প্রকোষ্ঠমধ্যে দুইটী যুবক কথোপকথন করিতেছেন। নিকটে একটি ভৃত্য একখানি তালবৃন্ত হস্তে তাঁহাদিগকে ব্যজন করিতেছে। ভাদ্র মাস, ভয়ানক গ্রীষ্ম। বেলা চারিটা বাজিয়া গিয়াছে, তথাচ দিনকরের প্রখর উত্তাপ কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। যুবকদ্বয়ের সুন্দর মুখ বার বার ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া সলিলসিক্ত কমলের ন্যায় বোধ হইতেছে। সুগন্ধি-যুক্ত রুমালের দ্বারা মধ্যে মধ্যে তাহা বিদূরিত করিতেছেন। একটি যুবা কহিলেন, "তোমার এ স্থান পছন্দ হইতেছে না কেন ?"

দ্বিতীয় যুবা কহিলেন. "দেশ হইতে বড় বেশী দূর, আর বড় গ্রীষ্ম। আমার বোধ হয় বিহার অঞ্চলের কোন স্থান হইলে আমার সুবিধা হইবে।"

প্রথম যুবা। এইখানেই তোমার বেশ সুবিধা হইবে, কারণ এখানে উকীল খুব অল্প। আমার এই দুই বৎসর এখানে আসিয়া যেরূপ সুবিধা হইয়াছে, বোধ করি অন্য স্থানে ছয় বৎসরেও এইরূপ হইত না। আর এখানকার জল-বায়ু অতি উৎকৃষ্ট, আমার শরীর এখানে খুব ভাল আছে।

দ্বিতীয় যুবা। দেখি কি করি। আমার এইখানে একটি বন্ধু আছেন, তিনি প্রায় কলিকাতায় থাকেন। বোধ হয় তিনি এখানে আসিয়াছেন। তাঁহাদের বাড়ী আমি দুইবার আসিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত একবার পরামর্শ করিবার ইচ্ছা আছে।

প্রথম যুবা। তুমি যে অমৃতবাবুর কথা বলিয়াছিলে, তিনিই না কি?

দ্বিতীয় যুবা। হাঁ তিনিই।

প্রথম যুবা। আমি তোমার নিকট তাঁহার অনেক প্রশংসা শুনিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব মনে করি, কিন্তু এই দুই বৎসর আছি, দেখা আর হয় না। এই শুনি তিনি আছেন, আবার শুনি চলিয়া গিয়াছেন। এবার আসিলে নিশ্চয়ই দেখা করিব।

দ্বিতীয় যুবা। আমার সঙ্গে যাইও। তিনি তোমার সঙ্গে আলাপ করিলে খুব সন্তুষ্ট হইবেন।

যুবকদ্বয়ের এইরূপ নানা প্রকার কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় একজন বৃদ্ধ যোগী আসিয়া একটি যুবাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তোমার নাম কি সুশীলকুমার?"

পাঠকও এতক্ষণ এই যুবককে চিনিতে পারেন নাই। ইনি মৃত রামদাস রায়ের দৌহিত্র, মৃতা হরসুন্দরীর পুত্র। ইনি এক্ষণে দ্বাবিংশতিবর্ষ বয়স্ক পরম সুন্দর যুবা।

সুশীলকুমার দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ।"

যোগী স্থূলাকার—কিঞ্চিৎ খর্ব্ব; চক্ষু ক্ষুদ্র—অতি উজ্জ্বল; নাসিকা দীর্ঘ ও অন্যান্য মুখাবয়ব সুন্দর। বক্ষ বিশাল—তাহাতে যজ্ঞসূত্র দুলিতেছে। দর্শনমাত্র বোধ হয় অনেক দিন অবধি যোগাভ্যাস

করিতেছেন। তাঁহার শুভ্রবর্ণ জটাজাল পৃষ্ঠদেশে পতিত হইতেছে। ভস্মাচ্ছাদিত শরীর ধূসরবর্ণ হইয়াছে। বয়স অনুমান ষাইট বৎসর হইবে। এত বয়স হইয়াছে, তথাচ বোধ হয় তাঁহার শক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তাঁহার সেই তেজোময় কান্তি দেখিলেই মনে ভক্তির উদ্রেক হয়।

যোগী গম্ভীর স্বরে সুশীলকুমারকে কহিলেন, "তোমাকে আমার কোন বিশেষ আবশ্যক আছে, আমার সঙ্গে আইস।"

সুশীলকুমার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, আপন উত্তরীয় ও যষ্টি লইয়া, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সন্ন্যাসী রাজপথ ও প্রান্তর অতিক্রম করিয়া বিন্ধ্যগিরি আরোহণ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতের নিম্নভাগে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা হইতেছে। জল অতি নির্ম্মল—তক্ তক্ করিতেছে। ভাগীরথীর অপর তীরে একটি সুবিস্তীর্ণ শ্যামল শস্যক্ষেত্র। তাঁহারা যে পথ দিয়া উঠিতেছিলেন তাহার দুই পার্শ্বে নানাবিধ বন্য ফুলের গাছ সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। এক পার্শ্বে একটী ঝরণা, তাহা হইতে ঝর্-ঝর্ শব্দে জলধারা নির্গত হইয়া পূর্ব্বোক্ত স্রোতস্বিনীর সহিত মিলিত হইতেছে।

সুশীলকুমার বিমুগ্ধচিত্তে এইরূপ প্রকৃতির শোভা দর্শন করিতে করিতে যাইতেছেন। পর্ব্বতোপরি মধ্যে মধ্যে পাণ্ডাদের ঘর। তাঁহারা এই সব পশ্চাতে ফেলিয়া ক্রমান্বয়ে উঠিতে লাগিলেন। এই প্রকারে বহুদূর যাইয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুদৃশ্য পবিত্র আশ্রম সুশীলকুমারের দৃষ্টিগোচর হইল। যোগিবর কহিলেন, "আর তোমাকে অধিক দূর যাইতে হইবে না, সম্মুখেই আশ্রম দেখা যাইতেছে।"

এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহারা একটী পরিচ্ছন্ন কুটীরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী কুটীর-দ্বার হইতে ডাকিলেন, "মা সরোজ! অতিথিকে আসন প্রদান কর।" কুটীর-মধ্য হইতে একটি যোগিনী, ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, তাঁহাদের উভয়কে দুইখানি কুশাসন প্রদান করিলেন।

যোগিনীর পরিধানে গেরুয়া বস্ত্র; গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা দোদুল্যমান্; হস্তে রুদ্রাক্ষের বলয়। তাঁহার আলুলায়িত রুক্ষ জড়িত কেশরাশি চরণ চুম্বন করিতেছে। যোগিনীর বয়ঃক্রম অনুমান পঁয়ত্রিশ বৎসর হইবে। সুশীলকুমার দেখিলেন—যোগিনী অনিমিষনেত্রে তাঁহারই প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন। সুশীলকুমার বিস্মিত হইলেন, কারণ সেরূপ স্নেহমাখা দৃষ্টি তিনি আর কখনও দেখেন নাই। তাঁহার মনে হইল, যেন যোগিনী তাঁহাকে দেখিয়া কোন দুর্দ্দমনীয় মনোবৃত্তি গোপন করিতেছেন। যোগিনী সুশীলকুমারকে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সুশীলকুমার তাঁহার জিজ্ঞাসিত বিষয় শুনিয়া কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিলেন। কারণ যোগিনী তাঁহাদের সমস্তই সাংসারিক বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, যথা—তাঁহার পিতা জীবিত আছেন কি না? তিনি কোন কার্য্য করেন কি না? মৃজাপুরে তাঁহাদিগের থাকা হইবে কি না—ইত্যাদি।

এইরূপ কথোপকথনে সূর্য্য অস্তাচলচূড়া [illegible] হইলে, পক্ষিকুল, দিনকরের অভাবে বিষণ্ণ হইয়া, নিঃশব্দে নি[illegible] কুলায় প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। সরোজিনী নাথের গমনে ম্রিয়ম[illegible]ল। যোগিগণ ভগবদারাধনার সময় উপস্থিত দেখিয়া আ[illegible] পবিত্র মনে

বিভুগুণ গানে মত্ত হইলেন। স্নিগ্ধ সান্ধ্য সমীরণ প্রবাহিত হইয়া যোগিদিগকে ব্যজন করিতে লাগিল। সকলেই এই পবিত্র সময়ে দেবাদিদেবের পবিত্র চরণ পূজা করিয়া কৃতার্থতা অনুভব করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে বনকুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া, সুগন্ধে যোগীদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া, তাঁহাদের পবিত্র হৃদয় মাতাইয়া তুলিতে লাগিল। গিরিবর অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

সুশীলকুমার নম্রতাসহকারে যোগিবরকে কহিলেন, "অনুমতি হয় তো এখন যাই।"

যোগী। হাঁ রজনী সমাগত, চল তোমাকে রাখিয়া আসি।

সুশীল। আপনি আর কেন কষ্ট করিবেন? আমি আপনার প্রসাদে স্বচ্ছন্দে নগরে পৌঁছিতে পারিব।

যোগী। আচ্ছা যাও, আবশ্যক হইলে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে।

যোগিনী যোগিবরকে কহিলেন, "বাবা! আমাদের গিরির অশ্বটি সুশীলকুমারকে দাও, গিরি আবার কল্য আনিবে।"

যোগিবর কহিলেন, "উত্তম, গিরি কোথায়?"

একটি অল্পবয়স্ক বালক আসিয়া উপস্থিত হইল।

যোগিবর কহিলেন, "গিরি, তোমার অশ্বটি সজ্জিত করিয়া আনিয়া দেও, আবার কল্য আনিও।"

বালক "যে আজ্ঞে" বলিয়া সত্বর অশ্বটি আনিয়া দিল। সুশীলকুমার যোগী ও যোগিনীকে প্রণাম করিয়া অশ্বারোহণে প্রস্থান করিলেন।

সুশীলকুমার প্রফুল্লিত মনে গমন করিতে লাগিলেন, কারণ যোগিবর তাঁহার পক্ষে বিশেষ আবশ্যক আছে বলিয়া আনিয়াছিলেন,

কে তাহার তো কিছুই বলিলেন না? আর যোগীর আশ্রমে যে স্নেহময়ী রমণী-মূর্ত্তি দেখিলেন—সে রমণী কে? তাঁহার প্রতি রমণীর এরূপ বাৎসল্যপূর্ণ দৃষ্টি কেন? এরূপ স্নেহমাখা দৃষ্টি তিনি জীবনে কখনও দেখেন নাই। সুশীলকুমার এই সমস্ত অভূতপূর্ব্ব ঘটনা মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে করিতে, অশ্বারোহণে গমন করিতে লাগিলেন।

বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে উক্ত পিশাচের পদতলে পতিত হইয়া মিনতি করিয়া কহিতেছে, "ওগো, আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছ? আমার বাবা-মা আমায় না দেখিয়া কতই কাঁদিতেছেন। তোমার পায়ে পড়ি আমায় বাড়ী দিয়া আইস।" হায়! কে তাহার এই প্রাণস্পর্শী হৃদয়ভেদী কথা শুনিবে! নরাধম তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না,—নানা প্রকার প্রবোধবাক্যে কহিল, "কাঁদিস না—চুপ কর্। তোরে এমন স্থানে বিক্রয় করিব যে, তুই রাজ-রাণীর মত থাকিবি। দুঃখীর মেয়ে চিরদিন দুঃখ পাইবি, তাই কি ভাল? কেন কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক লইয়া যাইব? আপনা হইতে চল্।" বালিকা নরাধমের এই ঘৃণিত বাক্যে অধিকতর চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল। তাহার সেই সকরুণ-রো[illegible]নি নৈশ গগন ভেদ করিয়া উঠিতে লাগিল।

এই হৃদয়বিদারক ব্যাপার সুশীলকুমারের [illegible]য় হইল না। তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ ও নিকটস্থ বৃক্ষে অশ্ব ব[illegible]র্ক—পাষণ্ড সতর্ক হইতে না হইতে—তাহার মস্তকে হস্ত[illegible]রা বিষ প্রহার করিলেন। পামর অতিশয় আহত হই[illegible]ত হইল। দুরাচারকে ভূতলশায়ী করিয়াই সুশীলকুমা[illegible]হার বক্ষে আরোহণ করিলেন। নরাধমের প্রতি দৃষ্টিপা[illegible]তনি অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিলেন। তাঁহার [illegible] কারণ আর কিছুই নহে, কেবল একটি অসহায়া বালিকা[illegible]র বিপদরাশি হইতে উদ্ধার। বালিকাটি এখনও অশ্বথ-পত্রের [illegible]থর-থর কাঁপিতেছে। সুশীলকুমার দেখিলেন, বালিকাটী অসামা[illegible]সুন্দরী। এমন

সরলতাময়ী সুন্দর-মূর্ত্তি তিনি আর কখন দেখেন নাই। তিনি বিমুগ্ধচিত্তে ভাবিলেন—এ মূর্ত্তি দেবী, না মানবী? এই অরণ্যময় ভূখণ্ডে এ মূর্ত্তি যেন বনদেবী বলিয়া প্রতীত হইতেছে।

তিনি অভয়-বচনে কহিলেন, "এখন আর ভয় কি? দুরাচার এখন সম্পূর্ণরূপে আমার করায়ত্ত হইয়াছে। আপনার পরিচয় দিন। আমি নির্ব্বিঘ্নে আপনাকে আপনার গৃহে রাখিয়া আসি।"

ঐ সময় সেই ভীষণাকার পিশাচ নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করিতেছিল। সুশীলকুমার দুষ্টের প্রতি সকোপ-দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "দুর্ব্বৃত্ত নরাধম! স্থির থাক্! নতুবা তোর জঘন্য জীবন বিনাশ করিয়া পৃথিবীর পাপভার লাঘব করিব।" এই বলিয়া তাঁহার উত্তরীয় দ্বারা নিকটস্থ বৃক্ষের শাখে উহাকে বাঁধিলেন ও বন্ধনমোচনাশঙ্কায় নিকটস্থ অরণ্য হইতে কতকগুলি কঠিন লতা আনিয়া পুনর্ব্বার দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলেন। [illegible]

বালিকা মারবেশময় যুবকের মনোহর-মূর্ত্তি অনিমিষ নয়নে দেখিতেছিল [illegible] কহিলেন [illegible]হার নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা স্মরণ করিয়া, গদ্‌গদ চি[illegible]বয়স্ক বালিকাবৎ সেইখানে দাঁড়াইয়াছিল। ইত্যবসরে সুশীলকুমার [illegible] করিয়া প্রফুল্ল অন্তরে রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করি[illegible] রমণীর সুচারু-বদনখানি লজ্জায় অবনত হইল। সুশীল[illegible]মণীর পরিচয় ও এই ঘটনার পূর্ব্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে[illegible] বালিকা লজ্জাযুক্ত কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "আমি, আমার মাতা [illegible]কতকগুলি আমাদের প্রতিবেশী পুরুষ ও রমণী বিন্ধ্যবাসিনীর [illegible] দিতে আসিয়াছিলাম। আমরা নানা স্থানে

দেব-দেবী দর্শন ও পূজা শেষ করিয়া, পরে কয়েকজন প্রতিবেশিনীর সঙ্গে পর্ব্বতের উপর যোগমায়া দেবী দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। আমি একাগ্রমনে দেবী দর্শন করিতেছি, কিছুক্ষণ পরে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি—আমার সঙ্গিনীরা সেই স্থানে নাই, এই সন্ন্যাসী আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইহাকে দেখিয়া আমার প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইল। এই সন্ন্যাসী আমায় কহিল, "তোমার সঙ্গিনীদের খুঁজিতেছ? তাহারা তো তোমায় ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমার সঙ্গে আইস, আমি তাহাদের নিকট তোমায় দিয়া আসি।" আমি তখন কি করিব? ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে ইহার সঙ্গেই চলিলাম।"

বলিতে বলিতে বালিকার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল।

সুশীলকুমার রোষকটাক্ষে সেই দস্যুর প্রতি [illegible] হিয়া কহিলেন, "নরাধম! ঘৃণিত কুৎসিত কাজ সাধিবার কি [illegible]শ নাই? ধন্য ভগবানের করুণা যে, তিনি তোর মত কপট [illegible]ীকেও তাঁহার এই মনোহর পৃথিবীতে স্থান দিয়া নিত্য প্রয়ে[illegible] দ্রব্য প্রদানে কুণ্ঠিত হইতেছেন না।"

বালিকা অবনতমুখী হইয়া যুবকের এই মধুর [illegible] শুনিতেছিল। সুশীলকুমার পুনর্ব্বার সেই সরলতাময়ী বালিকা[illegible] দৃষ্টি করিয়া মধুর স্বরে কহিলেন, "তার পর দুর্বৃত্ত কি করিল[illegible]

বালিকা। তার পর নানা প্রকার ভ[illegible] দিয়া এইখানে আনিল। আমি শেষে বুঝিতে পারিলাম, [illegible] মন্দ অভিসন্ধিতে আমায় লইয়া যাইতেছে। ক্রমে সন্ধ্যা হ[illegible]াগিল। আমার শরীরও ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। [illegible]মি কষ্টে ও ভয়ে

কাঁদিতে লাগিলাম। পরে দুরাচার তাহার গূঢ় অভিপ্রায় স্পষ্ট ব্যক্ত করিল ও আমায় টানিতে টানিতে লইয়া চলিল। আমি হতাশ হইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। ইহার পরের ঘটনা আপনি আসিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

সুশীল। কোন্ স্থানে আপনাকে রাখিয়া আসিব? আপনার বাড়ী কোথায়? অধিক রাত্রি হইয়া আসিল—শীঘ্র বলুন।

বালিকা। আমাদের বাড়ী সহরে—বিচ্ কটোরায়।

সুশীল। বিচ্ কটোরায়? আপনার পিতার নাম কি?

বালিকা। আমার পিতার নাম পশুপতি চক্রবর্ত্তী।

সুশীল সবিস্ময়ে কহিলেন, "আমি তো তাঁহাকে বিশেষ জানি। আপনি তাঁহ[illegible] কন্যা? আপনাদের বাড়ীতে অনেক দিন গিয়াছি, কৈ আপনা[illegible] কখন দেখি নাই। অমৃত বাবুর সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধু[illegible]।"

পাঠক [illegible] অবশ্য এখন এই বালিকাকে চিনিতে পারিয়াছেন; বালিকা [illegible] পূর্ব্বপরিচিত অমৃতলালের ভগিনী। ইহার বয়স ত্রয়োদশে[illegible] অধিক হইয়াছে।

সুশীল[illegible] পুনর্ব্বার কহিলেন, "তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? চলুন, [illegible]কে আপনার পিতা-মাতার কাছে রাখিয়া আসি। তাহারা আপ[illegible] কতই ভাবিতেছেন।"

যুবক আপ[illegible]শ্বের বল্গা ধরিয়া, ধীরে ধীরে পদব্রজে অগ্রসর হইলেন। ব[illegible] তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তাঁহাদিগকে প্রস্থান করিতে [illegible]খিয়া, সেই ভীষণাকার মনুষ্যরূপী পিশাচ ব্যাকুল

ভাবে কহিল, "আমার বন্ধন খুলিয়া দিন, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি আর কখন এমন কাজ করিব না।"

সুশীলকুমার কহিলেন, "তোর মত নরাধমকে মনুষ্য কখন ক্ষমা করিতে পারে না।"

বালিকা যুবকের প্রতি চাহিয়া করুণস্বরে কহিলেন, "ওকে অমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিলেন, যদি বাঘে খায়?"

সুশীলকুমার বালিকার ভাব দেখিয়া মনে করিলেন, "এ দেবী না মানবী?" তিনি মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, "এই দুষ্ট মুক্ত হইলে আমাদিগকে কি নির্ব্বিঘ্নে যাইতে দিবে? কল্য আসিয়া উহাকে মুক্ত করিব।"

এইরূপ কথোপকথনে তাঁহারা সেই ভয়ানক অরণ্য ছাড়াইয়া রাজ-পথে আসিয়া পড়িলেন। যুবক উর্দ্ধে দ [illegible] রিয়া দেখিলেন, রজনীর শিরোভূষণ চন্দ্রমা মধ্যাকাশে উজ্জ্বলরূপে [illegible] া পাইতেছে। বুঝিলেন, রজনী দ্বিতীয় প্রহর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মিলন।

মৃজাপুর সহর নিস্তব্ধ। সকলেই নিদ্রার মোহিনী মায়ায় অভিভূত হইয়া, নিদ্রা-দেবীর ক্রোড়ে বিশ্রাম-সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। কেবল এক একবার সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া শান্তিরক্ষকদিগের উচ্চ-চীৎকার-ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। এক একটী কুকুর উচ্চ শব্দ করিয়া চারিদিকে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। ঝিল্লিকাকুল ঝিল্লীরব করিতেছে। এক [illegible] পেচক উচ্চ শব্দ করিয়া, মনের আনন্দে, যেন কাহাকে ডা[illegible] থাকিতে, বিস্তৃত আকাশে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। ধর[illegible] শুভ্র চন্দ্রকিরণ পতিত হইয়া রজতরঞ্জনে প্রাণ-মন মুগ্ধ করিতে[illegible] সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হইয়া সমুদয় জগৎকে শীতল করিতেছে। [illegible] শোভার ভাণ্ডার—যে দিকে চাও অতুল শোভা। কিন্তু এ শো[illegible] মোহিত কয় জন? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী, সমুদয় মনুষ্যই তো নি[illegible]-দেবীর ক্রোড়ে অচেতন আছে। কতকগুলি লোক নিদ্রাকে পরাভূত করিয়া আপনাকে সচেতন রাখিয়াছে। সে কাহারা? রোগী, শোকী, পা[illegible] বিরহী ও প্রণয়ী। রোগী আপন রোগ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে[illegible] তাহার নিকট জগতের এ শোভা অপ্রকাশিত! শোকী আপন[illegible]নলে দগ্ধ হইয়া হা হা করিতেছে; তাহার নিকটেও এ [illegible] অপ্রকাশিত। পাপী আপনার পাপচিন্তায়,

পাপকার্য্যে ব্যতিব্যস্ত ; তাহার নিকটও এ শোভা অপ্রকাশিত। বিরহী বাঞ্ছিত প্রিয়ধনের কামনায় আত্মবিস্মৃত হইয়া অনিদ্রিত, সুতরাং তাহার নিকটও এই মনোরম শোভা অপ্রকাশিত। প্রণয়ী-প্রণয়িনী আপন সুখের স্বপ্নে বিভোর ; তাহাদের নিকটও এ শোভা অপ্রকাশিত। এ অতুল শোভা আপনাতে আপনি বিমুগ্ধ হইয়া আপনাতে আপনি ডুবিয়া যাইবে।

এইরূপ নিস্তব্ধতার মধ্যে একটী গৃহে দীপ জ্বলিতেছে। গৃহটি যদিও ছোট, কিন্তু গৃহস্বামীর যত্নে অতিশয় পরিষ্কৃত। সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে একটী ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান। চন্দ্রকিরণ পতিত হওয়ায় গৃহটী যেন হাসিতেছে। গৃহমধ্যে একটী প্রকোষ্ঠে দুই জন বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। কক্ষটীর কবাট ভিতর [illegible]ত বন্ধ, গবাক্ষ দিয়া দীপ-শিখা নির্গত হইতেছে। দুই জনের [illegible] একটী পুরুষ— অপরা রমণী। পুরুষের বয়স পঞ্চাশের অধিক [illegible] স্ত্রীলোকটির বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ।

পুরুষটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “আমি [illegible] কি করিব, বল? সাধ্যানুসারে খুঁজিতে তো ক্রুটী করিলাম না। নারায়ণের মনে যাহা আছে তাহাই হইবে। আর এই এত রাত্রে কোথায় বা যাই বল। হরি ও তাহার মা তো সেই অবধি খুঁজিতেছে। এত রাত্রে আমি আর কোথায় যাইব? চক্ষেও এখন অল্প দেখি।”

স্ত্রীলোকটী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, “[illegible]মি আর কোথায় যাইবে? ভগবান্ আমার কপালে যাহা লিখিয়া[illegible] তাহাই হইবে।

গুরুদেব ! তুমিই ভরসা। আমার অমৃত আসিলে আমি কি বলিয়া বাছাকে প্রবোধ দিব ? তার যে মোহিনী-অন্ত প্রাণ !”

রমণী আর বলিতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি ব্যাকুল ভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন।

বৃদ্ধ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, “সম্পত্তি খোয়াইলাম, দেশত্যাগী হইলাম : মনে করিলাম—এইবার বিদেশে আসিলাম, সুখী হইব। অমৃত বাঁচিলে আমার কিসের অভাব ? ওঃ আর সহ্য হয় না !—হরিহে ! তুমিই ভরসা।”

রমণী। বাছা মোহিনী আমার কখন কষ্টের মুখ দেখে নাই। বাছা বাপ, মা ও ভাই ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না। আহা ! বাছা আমার কতই কাঁদিতেছে।—মা বিন্ধ্যবাসিনি ! তোমার কাছেই আমার স্নেহের বাছা বাঁধিয়া আসিয়াছি। দেখো, মা ! আমার গচ্ছিত ধন যেন হারা যায় না।

এই সময় বাহির হইতে তাঁহাদের কবাটে কে আঘাত করিল। রমণী ব্যাকুল চিত্তে চীৎকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে ও ?—হরির মা ?” এই বলিয়া দ্রুত যেমন দরজা খুলিলেন, অমনি তাঁহার হারাধন মোহিনী, ক্ষুদ্র হস্ত দুইখানি দ্বারা তাঁহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তিনি তাঁহার হারারত্ন মোহিনীকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া, হৃদয়ে চাপিয়া, আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবের পর মোহিনী সুশীলকুমারকে দেখাইয়া কহিল, “বাবা, ইনিই আমাকে ভয়ানক বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া তোমাদের নিকট আনিয়াছেন।”

চক্রবর্ত্তী মহাশয় সুশীলকুমারকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং আনন্দে গদ্গদ হইয়া কহিলেন, "কেও আমাদের সুশীলকুমার না? বাবা সুশীল, এতক্ষণ অন্যমনস্কতাবশতঃ তোমায় দেখিতে পাই নাই, কিছু কি মনে করিয়াছ, বাবা?"

সুশীলকুমার বিনীত ভাবে কহিলেন, "আপনি ব্যস্ত হইবেন না। ইহাতে আর কি মনে করিব?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার স্ত্রীকে কহিলেন, "তুমি ইঁহাকে চিনিতে পার নাই, ইনি আমাদের বরাহনগরের রায় মহাশয়ের দৌহিত্র। সেই একবার হীরালাল বাবু ও ইনি আমার অমৃতের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইঁহারা আমার অমৃতের সঙ্গে এক স্কুলে পড়িতেন। ইনি আমার অমৃতকে বড়ই ভালবাসেন।—বাবা সুশীল, আমার কাছে আসিয়া বোস। মৃজাপুরে কি মনে করিয়া আসিয়াছ?"

সুশীল। আজ্ঞা, এখানে ওকালতী করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। আজ চার পাঁচ দিন হইল এখানে আসিয়াছি।

পশুপতি। তা বেশ, বাপু, এই খানেই কাজের সুবিধা করিয়া লও, তোমাকে দেখিলেও সুখে থাকিব।

সুশীল। তবে এখন আসি, রাত্রি অনেক হইয়াছে।

পশুপতি। আজ, বাবা, এই খানেই থাক। রাত্রি অনেক হইয়াছে। আজ তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ তা আর বলিয়া কি জানাইব? আশীর্ব্বাদ করি, নারায়ণ তোমাকে দীর্ঘজীবি করুন ও সুখে রাখুন। আজ, বাপু, এখানেই থাকিতে হইবে।

সুশীলকুমার কি বলিবেন কিছুই ঠিক্ করিতে পারিলেন না। মনে

মনে ভাবিলেন, মোহিনীকে যতটুক দেখি সেই সময়টুকুই পরম সুখের। সেই সুখটুকু কোন মতেই তিনি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। সুশীলকুমার মোহিনীর প্রফুল্ল-মুখখানির প্রতি একবার চাহিয়া দেখিলেন। মোহিনী যেন তাঁহার উত্তরের জন্য স্থির নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন। সুশীলকুমারের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল। তিনি সবিনয়ে কহিলেন, "আচ্ছা, আজ এইখানেই রহিলাম।"

পশুপতি মোহিনীর নির্ম্মল-মুখচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "বল দেখি, মা! কি হইয়াছিল? তুই বৃদ্ধ মা-বাপকে কাঁদাইয়া কোথায় গিয়াছিলি?"

মোহিনী [illegible]ক এক করিয়া সমুদয় ঘটনা বলিলেন। তাঁহারা সেই ভয়ানক[illegible]বলী শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

পশুপতি [illegible]ন, "মা ভগবানকে ধন্যবাদ দাও। তিনি এই সাধু পুরুষ পাঠা[illegible]তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন।"

নানা [illegible]র কথাবার্ত্তার পর তাঁহারা আহার করিয়া শয়ন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—*—

সুখের স্বপ্ন।

সুশীলকুমার দক্ষিণস্থ একটি প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়াছিলেন। শয়ন করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু আজ আর তাঁহার নিদ্রা নাই। নানা প্রকার চিন্তা জলস্রোতের ন্যায় ক্রমাগত তাঁহার হৃদয়ে প্রবাহিত হইতেছিল।—পর্ব্বতে সেই রমণী কে? কি মনে করিয়া যোগী তাঁহাকে লইয়া গিয়াছিলেন? যোগিনীর তাঁর প্রতি এরূপ বাৎসল্য ভাব কেন?—এইরূপ নানা বিষয় চিন্তা করিতে ক . হঠাৎ অরণ্য মধ্যে সেই ভীষণাকার পুরুষ, সেই ভয়চকিতা দোধরী মোহিনীর তৎকালীন ভাব, তাঁহার সেই হৃদয়ভেদী ক্রন্দন,— নয়ে সমস্ত ঘটনা তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়া পূর্ব্বচিন্তা দূর করিল।

তিনি মোহিনীর মোহিনী চিন্তাতেই মগ্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন—মোহিনী কি দেবী? তিনি কি আজ সেই দেবীকে অসীম সাহসে রক্ষা করিয়াছেন?—এই সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইতে লাগিল। মোহিনীর অপূর্ব্ব পবিত্রতা ও অসামান্য সরলতা হৃদয়ে উদিত হইল। তিনি ভাবিলেন, মোহিনী রমণীকুলের রত্ন, মোহিনী এই সংসার-কাননে একটী কমল, মোহিনী এই পৃথিবীতে দেব-বালা। একাধারে এত গুণ, এত পবিত্রতা তিনি কখন দেখেন নাই। তিনি মোহিনীর সমুদায়ই অসাধারণ দেখিতে

লাগিলেন। এই প্রকারে মোহিনীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। কিন্তু নিদ্রাতেও তিনি সেই চিন্তা হইতে অপসৃত হইতে পারিলেন না। নিদ্রাবস্থায় সুশীলকুমার মোহিনী-সংক্রান্ত নানা সুখময় স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ বালিকা-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত অমৃতময়-সঙ্গীতধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল; তিনি মনে করিলেন, পার্শ্বস্থ গৃহে এই সুধাময় সঙ্গীত হইতেছে। ক্রমে সেই সুমধুর সঙ্গীত উষা-সমীরণের সহিত সেই নির্জ্জন কুটীর ভেদ করিয়া, সুশীলকুমারকে বিমোহিত করিয়া, গগনে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সুশীলকুমার মুগ্ধ চিত্তে সেই সুধাময় সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন ও [illegible] মনে ভাবিতে লাগিলেন—আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? স্বপ্নই হইবে[illegible] এ সুরবালাকণ্ঠনিঃসৃত গীত এই পৃথিবীতে কোথা হইতে [illegible]?—বাস্তবিক এরূপ উচ্চ অথচ মধুরতাপূর্ণ সঙ্গীত তিনি আর [illegible] শুনেন নাই।

ক্রমে সেই সঙ্গীত নিস্তব্ধ হইল। সুশীলকুমার ভাবিলেন—মানবীর কি এইরূপ কণ্ঠ সম্ভবে? তবে এ বালিকা কে? এ গীত কি আমার মোহিনীর হইবে? "আমার মোহিনী" ভাবিয়াই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।—মোহিনী আমার? শিমুল-বৃক্ষে কি কখন পারিজাত ফুটে? আমি এমন কি তপস্যা করিয়াছি যে, নারীকুলে দুর্লভ দেবকুমারী, সুরসুন্দরী মোহিনী আমার হইবে? যে ভাগ্যবান্ পুরুষের হস্তে মোহিনীর চারু হস্ত সমর্পিত হইবে, তাঁহারই জীবন সার্থক। তিনিই এই দুঃখময় সংসারে সুখী।

সুশীলকুমা[illegible] ইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নয়ন উন্মীলন করিয়া

কি দেখিলেন? দেখিলেন—বাতায়ন-সম্মুখে একটী মনোহর পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তিনি যেমন সেই কমলটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি মোহিনীর চারু-বদনখানি সেস্থান হইতে অপসৃত হইল।

মোহিনী শয়ন করিয়া নিদ্রা-দেবীর অনেক ধ্যান করিয়াছিল। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে সুশীলকুমার তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। শুভক্ষণে সুশীলকুমার তাহাকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই অবধি সে সুশীলকুমারকে আত্ম-সমর্পণ করিয়ছে। মোহিনীর সরল হৃদয় ইতিপূর্ব্বে আর কেহই অধিকার করিতে পারে নাই। মোহিনী অনেক সুন্দর যুবা দেখিয়াছে, কিন্তু কেহই তাহার পবিত্র চিত্তের এ প্রকারের প্রেম পায় নাই। পশুপতি মহাশয় কোন দিন তাহার বিবাহের প্রস্তা[illegible] [illegible]লে মোহিনী নির্জ্জনে গিয়া কাঁদিত। তাহার সেই পবিত্রময় দোষহৃদয় সুশীলকুমারকে দেখিয়া যে কেন বিচলিত হইল, নরে সে নিজেই অনুভব করিতে সমর্থ হইল না। সুশীলকুমারের সৌন্দর্য্য অতীব মনোহর বলিয়া কি সে মুগ্ধ হইয়াছিল?—না, তাহা নহে, কারণ সে তদপেক্ষা অনেক সুন্দর যুবক দেখিয়াছে, কিন্তু সুশীলকুমারের বদনে যে একটী পবিত্র, কমনীয় ভাব আছে, তাহার তুলনা মিলা ভার। বোধ হয় এই কারণেই বালিকা অপ্রার্থিত জনে হৃদয় দান করিয়াছ।

কতক্ষণে সুশীলকুমারের নিদ্রা ভঙ্গ হইবে, কতক্ষণে তাঁহার সে হাস্যময় বিনয়পূর্ণ কথাগুলি শুনিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে, এই সকল চিন্তা করিতে করিতে তা[illegible] আর সে রাত্রে

নিদ্রা আসিল না। সে শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক উঠিয়া দেখিল, উষার স্নিগ্ধকর মৃদু সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, পূর্ব্বদিক শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে, একটী একটী পাখী ডাকিতেছে। এক্ষণে নিদ্রা আসা অসম্ভব জানিয়া মোহিনী আর শয়ন করিল না। হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করিয়া, পালঙ্কোপরি উপবেশন পূর্ব্বক, লোহিত বর্ণের পা দুখানি দুলাইতে দুলাইতে, একটী গীত গাহিতে লাগিল। সেই গীত-ধ্বনি সুশীলকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাকে জাগরিত করিয়াছিল। মোহিনী, সঙ্গীত শেষ করিয়া, চতুর্দ্দিকে পদচারণা করিতে করিতে, সুশীলকুমার যে গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন সেই গৃহের সম্মুখস্থ গবাক্ষ দিয়া, তাঁহার মনোহর রূপরাশি দেখিয়া নয়ন চরিতার্থ [illegible]ছিল। সহসা সুশীলকুমার নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, মো[illegible]র আকর্ণনয়নদ্বয় তাঁহারই প্রতি সংলগ্ন রহিয়াছে। অমনি মোহি[illegible] সেই মনোহর-মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল। সুশীলকুমারের হৃদয় অপরিসীম আনন্দে পূর্ণ হইল। তিনি ভাবিলেন—এ কি! মোহিনী এখন এখানে কেন? তবে তিনিও যেমন মোহিনীকে সর্ব্বদা দেখিতে অভিলাষ করেন, মোহিনীও কি সেইরূপ তাঁহাকে দেখিতে অভিলাষিণী? মোহিনীর বদনে আনন্দ ভাসিতেছিল। সুশীলকুমার মোহিনীর সেই প্রফুল্ল-বদনখানি চিন্তা করিতে করিতে শয্যা ত্যাগ করিলেন ও চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট বিদায় লইবার জন্য গমন করিলেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দসহকারে কহিলেন, "এ বেলা, বাবা, [illegible]নেই থাক।"

সুশীলকুমার বিনীতভাবে কহিলেন, "বাসার সকলে আমার জন্ম বোধ হয় বড়ই ভাবিত হইতেছেন, আমি এখনই যাইতে ইচ্ছা করি।"

পশুপতি। অচ্ছা তবে আজ এস, বাবা! এখানে কত দিন থাকা হইবে?

সুশীল। তাহার ঠিক নাই; যদি এখানে থাকা হয়, তবে এক সপ্তাহ মধ্যে বাড়ী গিয়া বাবাকে সমস্ত বলিয়া আসিব।

এই বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "এখানে যতদিন থাকিবে এক একবার এস, বাপু! আমার অমৃত শীঘ্রই আসিবে।"

সুশীল। আজ্ঞা আসিব। অমৃত বাবুর সহিত আমার সাক্ষাতের বিশেষ আবশ্যক আছে। তবে আজ আসি।

সুশীলকুমার একবার মোহিনীর প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। মোহিনী এক পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইয়া তাঁহাকে অতৃপ্ত নয়নে দেখিতেছে। যেমন সুশীলকুমার তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলেন, অমনি তাহার লজ্জামাখা সুধাংশু-বদন অবনত হইল। সুশীলকুমার হৃদয়খানি মোহিনীকে অর্পণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। মোহিনী তাঁহার প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে সুশীলকুমার তাহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িলেন। মোহিনী ক্ষুণ্ণমনে তাঁহারই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সুখ-শয্যা।

চুনিলালের উচ্চ প্রাসাদের একটি সজ্জিত প্রশস্ত কক্ষমধ্যে, বহুমূল্য কাষ্ঠের পালঙ্কোপরি দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় সুকোমল শরীর ঢালিয়া দিয়া, একটী যুবতী নিদ্রা যাইতেছেন। উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে নির্ম্মল চন্দ্রকিরণ আসিয়া যুবতীর তনু-লতা আলিঙ্গন করিতেছে। যুবতীর সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণের সহিত চন্দ্রমার বিমল শুভ্র কিরণ মিশিয়া যাইতেছে। উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া মৃদু-মৃদু দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হইয়া, যুবতীর মুক্তকেশজাল এবং তাঁহার পরিহিত ঈষৎ গোলাপী রঙ্গের সুচিক্কণ শাড়ীখানি অল্প অল্প উড়িতেছে। যুবতীর সুগোল মৃণাল-হস্তে সরু-সরু দুগাছি সুবর্ণ-বলয়। কর্ণে দুইটী হীরা-মুক্তা-জড়িত কুণ্ডল। গলদেশে দুইনর একটী মুক্তাহার, চাঁদের চারি-দিকে উজ্জ্বল-নক্ষত্রমালার ন্যায় বোধ হইতেছে। যুবতীর লোহিতবর্ণ কোমল হস্তে একখানি পুস্তক, পার্শ্বে রৌপ্যময় তাম্বুলাধারে কয়েকটী তাম্বুল। যুবতীর তৎকালীন অবস্থা দেখিলে মনে হয়, যুবতী পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। কক্ষটী অতি পরিপাটিরূপে সজ্জিত। গৃহস্থিত প্রত্যেক দ্রব্য গৃহকর্ত্রীর সুন্দর রুচির পরিচয় দিতেছে।

একটী যুবা ধীরে ধীরে সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধীরে ধীরে নিদ্রিতা যুবতীর পার্শ্বে বসিলেন। একখানি হস্ত আপন গণ্ডদেশে স্থাপন পূর্ব্বক অতৃপ্ত নয়নে যুবতীর রূপ-রাশি দেখিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ নিরীক্ষণের পর একবার গগনমধ্যস্থিত পূর্ণচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। পুনর্ব্বার যুবতীর প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন। এ হাসির অর্থ—"সুধাময়ি! সুধাংশুর সৌন্দর্য্য হইতে তোমার সৌন্দর্য্য অল্প কিসে?"

তৎপরে যুবতীর একখানি হস্ত আপন হস্তে লইয়া সাদরে ডাকিলেন, "উষা!"

উষাবতী শশব্যস্তে শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "কখন আসিয়াছ?"

হীরালাল। প্রায় আধ ঘণ্টা হইবে।

উষা। আমায় এতক্ষণ ডাক নাই কেন?

হীরালাল। তোমার সুধামাখা রূপরাশি দেখিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিতেছিলাম।

উষা হাস্য করিয়া কহিলেন, "এই চার বৎসরের দেখাতেও তৃপ্তি হয় নাই?"

হীরালাল। দেখায় কি তৃপ্তি হয়? তবে আমি চলিয়া গেলে তুমি অনিমিষ নয়নে চাহিয়া থাক কেন?

উষা। রমণীর নয়নানন্দ আর কি আছে?

হীরালাল। পুরুষের নয়নানন্দ আর কি আছে?

উষা। যাক্, আর সে কথা তুলিব না। অনেক সময় যাইবে। বল, সভায় আজ স্বামিজীর কেমন বক্তৃতা শুনিয়া আসিলে?

হীরালাল। বক্তৃতার বিষয় "সত্যের জয়"। বক্তৃতাটি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

উষা। বক্তৃতার বিষয়তো পূর্ব্বেই শুনিয়াছি, বিস্তৃত করিয়া বল।

হীরালাল। প্রাচীন সনাতনধর্ম্মই সত্যের আলয়। সমুদয় অসত্য বিনাশ করিয়া চিরকাল ইহা জয়যুক্ত হইবে।

উষা। ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল।

হীরালাল। লোকের জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে আশ্চর্য্য রূপে সনাতনধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে বেগবর্ত্তী স্রোতস্বিনীর ন্যায় ইহা সমুদয় সভ্য জগতে ছড়াইয়া পড়িতেছে, কাহার সাধ্য ইহার প্রতিকূলতা করে?

উষা। কেন, এই যে স্থানে কত নূতন মতের সৃষ্টি হইতেছে, কত প্রতিকূল সভা হইতেছে, ইহার বিরুদ্ধে কত বক্তৃতা হইতেছে, ইহাতে কি ইহার প্রতিবন্ধ হইবে না?

হীরালাল। বৃথা চেষ্টা। সত্যের বিঘ্ন করিবে মানুষের সাধ্য কি? তবে লোকবিশেষের সম্প্রদায়বিশেষের অনিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মের কি হইবে? সনাতনধর্ম্ম সত্যের আধার। এই যে ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্য-সমাজের শিক্ষিত লোক, ইঁহারা কাহার বলে এখনও তিষ্ঠিয়া আছেন? নারায়ণ স্বয়ং ইহার অনুষ্ঠাতা হইয়া সকলের হৃদয়ে সনাতনধর্ম্মের অক্ষয় বীজ নিহিত করিয়া দিতেছেন। একদিন নিশ্চয়ই ইহা সুফল প্রদান করিবে।

উষা। কিন্তু এই যে দেখিতেছি, বিরুদ্ধবাদীরা মনঃকল্পিত শাস্ত্র-ব্যাখ্যা দ্বারা সাধারণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছে?

হীরালাল। যে রূপেই হউক, যথার্থ ধর্ম্মপিপাসু হইয়া সাধন করিলে ভগবান সাধককে ফল প্রদান করেন। সাধক এক দিন অবশ্যই

প্রকৃত সত্য ধর্ম্ম কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। বিভিন্ন-মার্গাবলম্বী সাধকগণ কেবল ভগবানের প্রদর্শিত পথেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

সনাতনধর্ম্ম সীমাবদ্ধ ধর্ম্ম নহে। ক্ষেতের চাষা, কোণের বৌ, স্কুলের ছেলে, টোলের পণ্ডিত, পাশ্চাত্যসভ্যতাভিমানী শিক্ষক—সকলকেই সনাতনধর্ম্ম প্রতিপালন করেন—সকলেরই কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—যাহা সত্য, যাহা চিরস্থায়ী, তাহাই সনাতনধর্ম্ম। ইহা পূর্ব্বে ছিল এখন নাই, এরূপ নহে। সত্য পূর্ব্বেও ছিল এখনও আছে। ইহা চিরকাল নিত্য নূতন আকারে সাধু-হৃদয়ে সমুদিত হইয়া থাকে।

উষা। আচ্ছা, ইহারই মধ্যে এত মতভেদ দেখা যায় কেন?

হীরালাল। যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই স্বাধীনতা, যেখানে স্বাধীনতা সেইখানেই মতভেদ। এই পবিত্র ভারতের ন্যায় কোন স্থানেই ধর্ম্মের এত চর্চ্চা হয় নাই; কোন স্থানেই এত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক জন্মগ্রহণ করেন নাই; কোন স্থানেই ধর্ম্মের এত বিভিন্ন মত দেখা যায় না। কিন্তু সনাতনধর্ম্মের মূল স্থান প্রত্যেক সংস্কারকেরই ঠিক আছে। আর লোক-বিশেষের মত লইয়াই বা আমাদের কি হইবে? অধিকারিভেদে ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিলেই আমরা কৃতার্থ হইব।

উষাবতী গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন, "ঠাকুর ধন্য যে, তোমা হেন

পতিরত্ন দিয়া আমায় পরম সুখে রাখিয়াছেন! আমিও ধন্য, কারণ আমা হেন ক্ষুদ্র রমণী হইয়া তোমার ন্যায় দেবচরিত্র স্বামী পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। আমার ন্যায় ভাগ্যবতী কয় জন?"

বলিতে বলিতে উষার গণ্ড বহিয়া দুই ফোঁটা আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িল। উষা হীরালালের পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তকে দিলেন।

হীরালাল কহিলেন, "ধন্য ভগবান্ যে, তোমার ন্যায় অশেষ-গুণবতী পত্নী দিয়া আমায় কৃতার্থ করিয়াছেন। আমিও ধন্য, কারণ তোমার ন্যায় প্রকৃত ধর্ম্মপত্নী লাভ করিয়াছি। পৃথিবীতে আমার ন্যায় ভাগ্যবান্ কয়জন?"

উষা। আমি ক্ষুদ্র অধম, আমি কি বুঝি? তোমার ধর্ম্মেই আমি ধার্ম্মিকা, তুমি আমার শিক্ষা-গুরু। তোমার ন্যায় কয়জন পতি আপন পত্নীকে প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন?

হীরালাল। তুমিও আমার শিক্ষা-গুরু। আহা! সেই দিন গরিব ছেলেগুলিকে যখন তুমি নিজের হাতে স্নান করাইয়া, নূতন ধুতি পরাইয়া, নিজের হাতে পরিবেশন পূর্ব্বক নানাবিধ সুখাদ্য মায়ের মত খাওয়াইতেছিলে—তখন আমি স্বর্গের ছবি দেখিয়াছিলাম! যেখানে রোগী, সেখানে শোকী, যেখানে দুঃখী, সেই খানেই আমার উষা। যেখানে ভক্তি, যেখানে প্রেম, যেখানে বুদ্ধি, সেইখানেই আমার উষা। প্রিয়তমে, তোমার মত ভার্য্যা কার আছে? সেদিন যখন তুমি প্রতিবাসিনী রমণীদিগকে মহাভারত পড়িয়া শুনাইতেছিলে ও ব্যাখ্যা করিতেছিলে, তখন তোমার শিষ্য হইতে আমার অভিলাষ হইতেছিল। বাবা যখন সকলের নিকট তোমার সুখ্যাতি

করেন, তখন আমি আনন্দে অধীর হইয়া পড়ি। পাছে কোন রূপ আনন্দের চিহ্ন প্রকাশ হয়, সেই ভয়ে সে স্থান হইতে দ্রুত প্রস্থান করি।

উষা লজ্জিত হইয়া আরক্ত মুখে কহিলেন, "ওকথা বলিও না, আমি অতি ক্ষুদ্র। রাত্রি অনেক হইয়াছে, তোমার অসুখ করিবে। এখন নিদ্রা যাও।"

তৎপরে উভয়ে সুখ-শয্যায় শয়ন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পিত্রালয়ে গমন।

অদ্য স্নেহলতার খুল্লতাত স্নেহকে ও তাঁহার মাতাকে লইতে আসিয়াছেন। স্নেহের পিতা যদুনাথ সাংঘাতিক পীড়িত। শ্যামা এই দুঃসংবাদ শ্রবণ করিয়া ব্যাকুলভাবে অবিরত অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। স্নেহও মাতার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতেছেন। সকলেই ঘোর বিষাদ-সাগরে মগ্ন।

কতক্ষণ পরে শ্যামা তাঁহার ভ্রাতার নিকট গিয়া, সরোদনে সবিশেষ বলিয়া, স্বামীগৃহে যাইবার প্রস্তাব করিলেন।

চুনিলাল প্রথমে সমুদয় শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। পরক্ষণেই তাঁহার মনে অন্য ভাবের উদয় হইল। তিনি কহিলেন, "শ্যামা, আমার বোধ হয় ইহার কোন গূঢ় কারণ আছে, কখনই যদুনাথের কোন পীড়া হয় নাই। আমার বোধ হয় তোমাদের লইয়া যাইবার তাঁহার কোন বিশেষ মৎলব আছে।"

শ্যামা। সে কি, দাদা! এ কি কখনও হইতে পারে? আমার সঙ্গে তিনি মৎলব করিবেন? নিশ্চয় তিনি পীড়িত হইয়াছেন। তুমি অদ্যই আমার যাইবার নৌকাদি সব ঠিক করিয়া দাও। কল্য প্রাতঃকালেই আমি রওনা হইব।

চুনিলাল। শ্যামা, বুঝিয়া কাজ করিও—যাইও না—আমার কোন মতেই ভাল বোধ হইতেছে না।

শ্যামা। না, দাদা, আমার মন বড়ই অস্থির হইয়াছে, আমি যাইব—বাধা দিও না।

চুনিলাল। তোমাকে আমি আর কিছু বলিব না, তোমার যাহা ইচ্ছা কর; কিন্তু স্নেহকে লইয়া যাইতে পারিবে না।

শ্যামা। সে কি, দাদা! তাও কি কখন হয়? স্নেহ তাঁহার একমাত্র সন্তান। স্নেহকে তিনি প্রাণাপেক্ষা স্নেহ করেন। স্নেহকে দেখিবার জন্যই তিনি বিশেষ উৎসুক হইয়াছেন।

চুনিলাল মস্তক ডুলাইয়া বলিলেন, "তা তুমি স্নেহকে কখনই লইয়া যাইতে পারিবে না। স্নেহকে লইয়া যাইবার যে বিশেষ আবশ্যক তা আমি বেশ জানি!"

শ্যামা ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমাদের যাইবার সব ঠিক করিয়া দাও, দাদা! তোমার পায় পড়ি—আর বাধা দিও না।"

চুনিলাল স্নেহের ভগিনীর চক্ষে জলধারা দেখিয়া সব ভুলিয়া গেলেন। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, তাঁহার অনুমান মিথ্যাও হইতে পারে। যদি সত্যই যদুনাথ পীড়িত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহাদিগকে না পাঠাইলে চিরদিন শ্যামার ও স্নেহের মনে একটা দুঃখ থাকিয়া যাইবে! এই সমুদায় চিন্তা করিয়া অগত্যা স্বীকৃত হইলেন এবং একজন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া নৌকাদি প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিলেন।

শ্যামা অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। রজনীতে যে যার কার্য্য সমাপন করিয়া স্বীয় স্বীয় কক্ষে শয়ন করিলেন। শ্যামাও স্বীয় কক্ষে শয়ন করিলেন। শয়ন করিলেন মাত্র, আজ আর তাঁহার নিদ্রা নাই। নিদ্রার পরিবর্ত্তে স্বামীর নানারূপ অমঙ্গল-চিন্তা আসিয়া তাঁহার মন অধিকার করিল। নয়ন হইতে জলধারা প্রবাহিত হইয়া উপাধান সিক্ত করিতে লাগিল। আহা! তাঁহার সরল হৃদয়ে স্বামীর কত প্রকার অমঙ্গল-কল্পনার উদয় হইতে লাগিল। জলস্রোতের ন্যায় কত চিন্তা, অবিশ্রান্ত তাঁহার হৃদয়ে আসিয়া, তাঁহাকে ব্যাকুল করিতে লাগিল। স্বামী যাইবার সময় যে সকল বাদানুবাদ করিয়াছেন, তৎসমুদায়ই তাঁহার নিজের অপরাধ মনে করিয়া কত অনুতপ্তা হইতে লাগিলেন এবং সেই স্বকৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। স্বামী যাইবার সময় যে বলিয়া গিয়াছিলেন, "জন্মের মত চলিলাম" —পতিব্রতার মনে ঘন-ঘন তাহা উদয় হইয়া তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল। শ্যামা প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর কখন স্বামীর বিরুদ্ধে কোন কথা কহিবেন না। আহা! তাঁহার পবিত্র সরল হৃদয় প্রতি মুহূর্ত্তে স্বামীর অমঙ্গল চিন্তায় কাতর হইতে লাগিল। বিপদহারী মধুসূদনের নিকট স্বামীর মঙ্গলার্থে কতই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

এইরূপ দুর্ব্বিসহ চিন্তায় এক, দুই, তিন করিয়া কক্ষস্থ ঘটিকায় চারিটা বাজিয়া গেল। শ্যামা বাতায়ন-পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন পূর্ব্বক সূর্য্যের আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ও তন্ময় চিত্তে গাহিতে লাগিলেন,—

যদি শেষের সে দিনে না পড়ে, মা মনে,
তাই দিনে দিনে ব'লে রাখি তোরে।
আমার ছাড়িতে নিশ্বাস নাই, মা! অবকাশ,
প'ড়ে এ অকুল-সংসার-পাথারে।
বড় সাধ মনে ছিল, গো মা তারা!
পূজিব তোমারে হ'য়ে আত্মহারা—
সে সাধ আমার পূরিল না আর,
ভাসিয়া গিয়াছে দূর-দূরান্তরে!
শুন, মা অভয়া! ব'লে রাখি তোরে,—
কোলে তুলে নিও সেই শেষবারে,
পূরাইও আশ জনম অন্তরে,
মন-সাধে আমি সেবিব তোমারে।

দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বাকাশে সুখতারা দেখা দিল। প্রতিবেশিনী দুই একটী বৃদ্ধা স্বীয় বৌ-ঝিদের ডাকিয়া, কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়া, পাড়ার সঙ্গিনীদের ডাকিয়া লইয়া গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেলেন। ক্রমে, পূর্ব্ব গগন পরিষ্কার হইল। সুস্নিগ্ধ প্রাতঃসমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। সূর্য্যদেব যেন শ্যামার স্তবে তুষ্ট হইয়া সহাস্য-বদনে ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বাকাশে প্রকাশিত হইলেন। তাহা দেখিয়া বিহঙ্গকুল মঙ্গলসূচক সঙ্গীত-ধ্বনি করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে আনন্দ-সংবাদ প্রচার করিতে ধাবমান হইল। সেই বিহগকণ্ঠ-নিঃসৃত মধুর ধ্বনি শুনিতে শুনিতে ঈশ্বরের পবিত্র নাম উচ্চারণপূর্ব্বক সকলে শয্যা পরিত্যাগ করিলেন।

শ্যামা প্রাতঃক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সমুদয় দ্রব্যাদি বোটে উঠান হইল। তাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া সকলের নিকট বিদায় লইতে লাগিলেন। স্নেহ বিষণ্ণ হৃদয়ে ও অশ্রুপূর্ণ নেত্রে প্রিয়-সহচরী উষাবতীর নিকট বিদায় লইতে গেলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন—উষা পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া, উপাধানে মুখ লুকাইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন।

স্নেহ উষার পার্শ্বে বসিয়া ডাকিলেন, "বৌঠাকৃরুণ!"

উষা স্নেহের গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। স্নেহ উষার বিচ্ছেদ ভাবিয়া, একবারে অস্থির হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অনেক্ষণ উভয়ে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিলেন, কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

উষা স্নেহের অধীরতা দেখিয়া ক্রন্দন সম্বরণপূর্ব্বক স্নেহের অশ্রু মুছাইতে মুছাইতে কহিলেন,"অসুখ করিবে, আর কেঁদ না, দিদি।"

স্নেহ। আমি কাঁদিবার জন্যই হইয়াছি—চির দিন কাঁদিব।

উষা। ও কি কথা, অমন কথা কি মুখে আনিতে আছে?

স্নেহ মনের আবেগে বলিলেন, "বৌঠাকৃরুণ! অমৃতবাবুকে বলিও।"

উষা। কি বলিব, বলনা। আমার কাছে আবার লজ্জা!

স্নেহ। না—কিছু না।

উষা। বটে, আমার কাছে বলিবে না? আচ্ছা অমৃতবাবু আসিলে বলিব, স্নেহ তোমার জন্য ক'নে খুঁজিতে গিয়াছে।

স্নেহের মুখে আজ আর হাসি আসিল না। তিনি ধীরে কহিলেন, "সে ভার তোমার উপর দিয়া গেলাম।"

উষা। আচ্ছা, সে ভার আর তোমায় দিতে হইবে না—আমি তাহা পূর্ব্বেই ঠিক রাখিয়াছি। এখন বল, কি বলিতেছিলে?

স্নেহ। বলিও, জন্মের মত ভুলিতে। আহা! তাঁহার সরল হৃদয়ে আমি কতই কষ্ট দিয়াছি।

বলিতে বলিতে স্নেহের কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া আসিল, আর বলিতে পারিলেন না।

উষাবতী সস্নেহে স্নেহের স্নেহমাখা বদনখানি মুছাইতে মুছাইতে কহিলেন, "ছি, ভাই স্নেহ! তুমি ও সব কি বলিতেছ? অমন কথা মুখে আনিও না।"

স্নেহ। বৌঠাকুরুণ! আর কোন বাসনা নাই। কিন্তু, জানিনা কেন, দেখিবার ইচ্ছাটা কোন মতেই যাইতেছে না। আর একটীবার দেখিতে বড় ইচ্ছা রহিল।

উষা। ছিঃ ভাই! এক মাসের জন্য যাইতেছ, এত অধীর হইতেছ কেন?

স্নেহ। কি জানি। তোমরা বলিতেছ, এক মাসের জন্য—আমার মনে হইতেছে, সুখের দিন অস্ত হইল। এখন অবশিষ্ট জীবনের জন্য দুঃখময় সাগরে ঝাঁপ দিতে যাইতেছি। জানি না কি হইবে! ঠাকুরের যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক।

এমন সময় শ্যামা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "মা স্নেহ! এখন তবে এস। বৌমা! সাবধান হইয়া থাকিও। তোমায় আর বেশী কি বলিব, মা! দাদার যেন কোন বিষয় কষ্ট না হয়। বৌঠাকুরাণীর শরীর অসুস্থ—তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করিও।"

উষা সাশ্রুলোচনে শ্যামার পদধূলি গ্রহণ করিলেন ; তৎপরে স্নেহের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "সর্ব্বদা চিঠি লিখিও।"

স্নেহ কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না। মাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। শ্যামা একে একে সকলের নিকট বিদায় লইয়া বোটে উঠিলেন। মাঝিরা বোট খুলিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই অদৃশ্য হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

নূতন দেশ।

পাঁচ দিনের পর বোট আসিয়া পদ্মার বিশাল বক্ষে পড়িল। বর্ষাকাল অবসানপ্রায়। চঞ্চলা পদ্মা এখন স্থিরজলরাশিতে পূর্ণা। চতুর্দ্দিক ধূমাকার দৃষ্ট হইতেছে। মৎস্য কচ্ছপ আদি জলচর জন্তু সকল উল্লাসে নদীর জলে ক্রীড়া করিতেছে। শ্যামল-পত্রাচ্ছাদিত তরুকুল, সুগন্ধি-কুসুমে সজ্জিত হইয়া, পার্শ্বস্থ বনভূমি সৌরভে পূর্ণ করিতেছে। বিহঙ্গমগণ বৃক্ষের উচ্চ শাখায় উপবেশন করিয়া, দিগদিগন্ত সুস্বর-লহরীতে ভাসাইতেছে। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পাখীগুলি লতাগুল্মের কোমল-পত্রাবরণে লুকাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। তরুতল বালুকাময় ও পরিচ্ছন্ন—মধ্যে মধ্যে লতাগুল্মের কুঞ্জবন। সমুদায় বনভূমি পবিত্রতা ও শান্তির আবাসস্থান বলিয়া বোধ হইতেছে।

প্রকৃতির এই মনোহারিণী শোভা দেখিতে দেখিতে সপ্তম দিবসে বোট বিক্রমপুর ঘাটে পৌঁছিল। নদীর নিকটেই যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী। তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা পাইয়া দুইটী প্রাচীনা আসিয়া শ্যামা এবং স্নেহকে বোট হইতে তুলিয়া লইয়া গেল। শ্যামা বাড়ীর নিকট যাইয়া সহসা চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন—যদুনাথ দিব্য সুস্থ শরীরে বাহিরের দরজায় দাঁড়াইয়া, হুকা হস্তে তামাকু টানিতেছেন

ও মৃদু-মৃদু হাসিতেছেন! তাঁহার শরীরে পীড়ার চিহ্নমাত্র নাই। স্নেহ যদুনাথকে প্রণাম করিয়া, প্রাচীনাদ্বয়ের সঙ্গে শ্যামার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা পাইয়া বাড়ীর ও পাড়ার সমুদায় স্ত্রীলোকেরা ব্যস্তসমস্ত হইয়া দেখিতে আসিল, এবং দিগন্ত কাঁপাইয়া হুলুধ্বনি দিতে আরম্ভ করিল। সেই আকাশব্যাপী হুলুধ্বনি শুনিয়া এবং প্রায় সকল বালিকা, যুবতী ও প্রৌঢ়ার নাসিকাতে এক একটি আলম্বিত ঘণ্টার ন্যায় স্বর্ণময় নোলক দোদুল্যমান্ দেখিয়া, স্নেহের সেই বিষাদমাখা শুষ্ক ওষ্ঠে হাস্য দেখা দিল। শ্যামা কখনও স্বামীগৃহে আসেন নাই, তাঁহার পক্ষে সমুদায়ই নূতন। কিন্তু তাঁহার মন এই সমুদায়ের কিছুই লক্ষ্য করিতেছিল না, তিনি যদুনাথকে তদবস্থায় দেখিয়া অবধি অত্যন্ত শঙ্কিতা হইয়াছিলেন। চুনিলাল তাঁহাকে যে সন্দেহের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বার-বার তাঁহার স্মরণ হওয়ায় তিনি অধিকতর ভীতা হইতে লাগিলেন। একটী প্রৌঢ়া শ্যামার হস্ত ধরিয়া, একটী গৃহমধ্যে লইয়া, নানারূপ কুশল-প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। পরিচয়ে জানা গেল—ইনি শ্যামার দেবরপত্নী।

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া সকলেই দুই-চারিটি আলাপ করিয়া প্রস্থান করিল। প্রতিবেশিনীরা শ্যামার হস্তাধিক অবগুণ্ঠন না দেওয়া, নির্লজ্জার ন্যায় আলাপাদি করা, এবং স্নেহের অলৌকিক রূপ প্রভৃতি আন্দোলন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

স্নেহ এতক্ষণ দাঁড়াইয়া এই সমুদায় ব্যাপার দেখিতেছিলেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার নাম ধরিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল। স্নেহ পরিচিত স্বর শুনিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, একটী যুবা দাঁড়াইয়া

হাসিতেছেন। স্নেহও ঈষৎ হাসিলেন। এই যুবা স্নেহের খুল্লতাত-পুত্র নিরুপম। ইনি মধ্যে মধ্যে স্নেহের মাতুলালয়ে যাইয়া থাকেন। ছেলেটীর বয়স একুশ-বাইশ বৎসর হইবে। দেখিতে শুনিতে লেখা-পড়ায় মন্দ নয়।

স্নেহ নিরুপমের সহিত আর একটী গৃহে গেলেন। সেই ঘরটী নিরুপমের। ঘরখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দুই একখানি সুন্দর সুন্দর দ্রব্যে সাজান। নিরুপম স্নেহকে আপন শয্যাপার্শ্বে বসাইয়া কহিলেন, "স্নেহ! তোমার এখানে একটুও ভাল লাগিতেছে না—না? গিরির সঙ্গে আলাপ করিলে অনেকটা ভাল বোধ করিবে। ঘরে আর কেহ নাই এই সময় তাহাকে আনিয়া তোমার সঙ্গে আলাপ করাইয়া দেই।" এই বলিয়া দ্রুতপদে সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। গিরিবালা নিরুপমের স্ত্রী।

স্নেহ অবসর পাইয়া সকল অবস্থা ভাবিতেছেন, এমন সময় নিরুপম গিরিবালাকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইলেন। গিরি অর্দ্ধ-ঘোমটা দিয়া আসিয়াছিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া ঘোমটা সরাইয়া দিলেন। স্নেহ দেখিলেন, দিব্য চাঁদের মত মুখখানি। চক্ষু দুইটি বড়-বড়, ভ্রু দুটি টানা, কপালখানি মাজা—তাহাতে কোঁকড়া-কোঁকড়া কাল চুল-গুলি পড়িয়াছে, রং বেশ উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ। পাত্‌লা-পাত্‌লা রাঙ্গা টুক্-টুকে ঠোঁট দুখানি টিপে-টিপে মৃদু-মধুর হাসিতেছে। গড়নখানি পাত্‌লা ও আকৃতি ছোট। বয়স চতুর্দ্দশের অধিক বোধ হয় না।

স্নেহ সহাস্যে গিরির একখানি হাত ধরিয়া, আপনার পাশে

বসাইয়া কহিলেন, "বেশ সুন্দরী বৌ, নিরুদাদা! তবে আমাদের কাছে মিথ্যা বড়াই কর নাই!"

নিরুপম। হুঁ মিথ্যা বড়াই! আমার আর একটী বিদ্যাধরীকে দেখিলে তুমি মূর্চ্ছা যাইবে।

স্নেহ। সে কি, নিরুদা! আবার একটি বিয়ে করিয়াছ নাকি?

নিরু। তা না হইলে কি কুলীনের মর্য্যাদা থাকে? বাবা ও জ্যেঠা মহাশয় বলিয়াছেন, আর দুইটি করিতেই হইবে—নতুবা তাঁহাদের মেয়ের বিয়ে হইবে না।

স্নেহ। না, নিরুদা! আর বিয়ে করিও না, দেখ দেখি কেমন লক্ষ্মীর মত বৌটি!

নিরুপম হাসিয়া বলিলেন, "না, দিদি! আবার? বাবার ও জেঠা মহাশয়ের নিতান্ত অনুরোধে এই বিয়েটা করিয়াছি। কিন্তু তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আর আমাকে এ বিষয় অনুরোধ করিবেন না।"

তাঁহাদের এই প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় একটী বৃদ্ধা আসিয়া স্নেহকে আহারের জন্য ডাকিল। স্নেহ গিরিবালার হস্ত ধরিয়া আহারের স্থানে লইয়া গেলেন। আহারাদি শেষ হইলে সকলে শয়ন করিলেন।

শ্যামা শয়ন-গৃহে গিয়া দেখিলেন—যদুনাথ খাটে বসিয়া তামাকু টানিতেছেন। শ্যামা গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র সহাস্য বদনে শ্যামার হস্ত ধরিয়া বসাইয়া কহিলেন, "শ্যামা, আজ আমি সুস্থ হইলাম, আমার পীড়া আরোগ্য হইল।"

শ্যামা বুঝিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, কোন উত্তর করিলেন না।

যদুনাথ পুনরায় কহিলেন, "কেমন, শ্যামা, তোমাদের এখানে আনিয়া ভাল করি নাই?"

শ্যামা এবার বিরক্তিপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "কেন আর জ্বালাও!"

যদু। বিরক্ত হও কেন? মঙ্গল-কার্য্যে কি বিরক্ত হইতে আছে? আমি স্নেহের জন্য আমা অপেক্ষা উচ্চ কুল-মান-সম্পন্ন সুপাত্র স্থির করিয়াছি। কল্যই পুরোহিত ডাকিয়া বিবাহের দিন স্থির করিব।

শ্যামার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। তিনি কাতর ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন, "তোমার কাছে আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ? তোমার পায় ধরিয়া মিনতি করি, আমার একমাত্র স্নেহের ধন, স্নেহের পুত্তলী স্নেহকে চির-দুঃখময় সমুদ্রে নিক্ষেপ করিও না।"

যদু। তুমি দুঃখ মনে করিতে পার, কিন্তু আমি ইহাতে পরম সুখ অনুভব করি।

শ্যামা। এই জন্য এত ছলনা করিয়া আমাদিগকে আনিয়াছ! আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই! দাদা, তুমি দেবতা! তোমার অনুমান মিথ্যা হইবার নয়। আহা! তুমি আমায় আসিতে কতই বারণ করিয়াছিলে! হায়! আমি তখন কেন তোমার কথা শুনিলাম না?

যদু। আঃ কেন বিরক্ত কর?

আজ শ্যামা ফাঁদে পড়িয়াছেন। শ্যামা পুনর্ব্বার কাতর স্বরে কহিলেন, "তোমার পায়ে পড়ি, এই ভয়ানক সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর,

কেন চির অশান্তি ডাকিয়া আনিবে? কেন শত্রুর ন্যায় আমার সর্ব্ব-নাশ করিবে? আহা! আমার স্নেহ যে বড়ই পিতৃবৎসলা, তার কি এই পুরস্কার?"

যদু। বিরক্ত করিও না, ঘুমাইতে দাও।

শ্যামা অগত্যা শয্যার একপার্শ্বে বসিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কত প্রকার ভাবনা আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল। ভাবনার শেষ নাই, অশ্রুরও বিরাম নাই।

দশম পরিচ্ছেদ

—*—

বিন্দা পিসি।

বিক্রমপুরস্থ রূপসা নামক গ্রামে যদুনাথের বাড়ী। সেই গ্রামে "বিন্দা পিসি" বলিয়া এক কুলীন-কন্যা বাস করেন। তিনি জ্ঞাতি-সম্পর্কে যদুনাথের পিসি হন। গ্রামস্থ সকলেই তাঁহাকে "বিন্দা পিসি" বলিয়া ডাকিত। বিন্দা পিসির বয়স প্রায় ষাইট বৎসর। বৎসর দুই হইল, কোন এক নব্বই বৎসরের বৃদ্ধের গলে বরমাল্য প্রদান করিয়া অনূঢ়া নাম ঘুচাইয়াছেন। বৃদ্ধ, বিবাহের দিন দশ-পরেই—বিন্দা দেবীকে বিধবা করিয়া—পরলোক গমন করিয়াছেন। বিধবা বিন্দা দেবী কুল-গৌরবে সদাই গর্ব্বিতা। বিন্দা পিসি একটী অতি গুরুতর কাজে প্রায়ই ব্যস্ত থাকেন। তিনি গ্রামের সমুদয় বার্ত্তা প্রতিগৃহে বহন করিয়া থাকেন। বোধ হয় শ্যামার আগমনবার্ত্তা পাইয়া আজ যদুনাথের গৃহে আগমন করিয়াছেন। বেলা চারিটার সময় বিন্দা পিসি যদুনাথের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। ঘরের বৌ-ঝি সকলেই, আপন আপন হাতের কাজ ফেলিয়া, বিন্দা দেবীকে অভ্যর্থনাসহকারে বসাইয়া, তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া বসিলেন। যেন অমাবস্যার রজনীকে নক্ষত্র ঘিরিল!

কেহ বলিল, "বিন্দা পিসি আমাদের একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন।"

কেহ বলিল, "বিন্দা পিসি এক মাস পরে আসিয়াছেন।"

কেহ বলিল, "পথ ভুলিয়া আসিয়াছেন বুঝি?"

বিন্দা দেবী বলিলেন, "হাঁ তাইতো, এখনকার মেয়ে তোরা। তোদের কথায় কে পারে? বাবা, আমরাও এককালে যুবতী ছিলাম, কৈ তোদের মত তো এক দিনও ছিলাম না। হরধন মুখর্য্যার পনেরো বছরের মেয়েটা কি কাণ্ডই করিয়াছে!"

তাঁহার এই বার্ত্তার সূত্রপাত দেখিয়া সকলেই কহিয়া উঠিলেন, "কি করিয়াছে, বিন্দা পিসি?"

বিন্দা পিসি হাত নাড়িয়া মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, "বরকে ভালবাসাইতে যাইয়া ঔষধ খাওয়াইয়া পাগল করিয়াছে।"

বিন্দা পিসির এই কথা শুনিয়া সকলেই "আহা!" "আহা!" করিয়া উঠিল।

কেহ বলিল, "ছুঁড়ি আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করিল।" কেহ বলিল, "আহা—এই অল্প বয়স!" কেহ বলিল, "তার স্বভাবের দোষ আছে।" কেহ বলিল, "আহা! অমন কথা বলিও না, মাতঙ্গীর স্বভাব বড় ভ . ।"

একজন জিজ্ঞাসা করিল, "মাতঙ্গীর স্বামীর বিয়ে কয়টা?"

একটা প্রৌঢ়া উত্তর করিলেন, "বিয়ে আর বেশি কি, এই বাইশ-তেইশ বৎসর বয়স মাত্র, ছয়টা বিয়ে বই তো নয়?"

একটী যুবতী হাসিয়া কহিল, "বাইশ-তেইশ বৎসর বয়সে ছয়টা বিয়ে বুঝি বড় কম হইল?"

বিন্দা পিসি মুখভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "তোরা কলিকালের মেয়ে,

তোরা সব একলা ভোগ করিতে চাস্। কুলীনের ঘরে জন্মিয়াছিস্—অত সুখের আশা কেন? বাইশ বছরে ছয়টা বিয়ে বেশি হইল? আমার কর্ত্তা নব্বই বৎসর বয়সে একশোর বেশি বিয়ে করিয়াছিলেন। কুলীনের শিরোমণি! অমন কুলীন কি আর আছে?"

বিন্দা দেবীর চক্ষে জল আসিল। তাঁহার ভাব দেখিয়া কোন কোন যুবতী তাঁহার অসাক্ষাতে মুখ লুকাইয়া হাসিতে লাগিল।

বিন্দা পিসি চক্ষু মুছিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "বাবা, এখনকার মেয়েদের পায় নমস্কার! সে দিন অমনি রাম গাঙ্গুলীর মেয়েটা স্বামীকে ভালবাসাইতে গিয়া এমনই ঔষধ খাওইয়াছিল যে, ছোঁড়াকে মারিয়া ফেলিল। আহা! ছোঁড়ার বয়সই বা কত—চল্লিশের বেশি হইবে না। সর্ব্বনাশীও তেমনি লজ্জায় ও ঘৃণায় গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে। কেবল বাইশটা অভাগিনীকে বিধবা করিয়া গিয়াছে। আরে মোল! তোদের ভালবাসিয়াই বা কি করিবে? তাদের কি চাল-চুলা আছে, যে তোদের নিয়া যাইবে? না টাকা-কড়ি, সোনা-দানা আছে যে দিয়া সোহাগ করিবে? তবে ভালবাসিলেও যা, না ভালবাসিলেও তা। বাবা, কি কলিকালই হইয়াছে। হতভাগিনীদের মরণ নাই? আর মরিয়াই বা কি হইবে? যমের নরকেও আর স্থান কুলায় না।"

পূর্ব্বোক্তা প্রৌঢ়া বলিয়া উঠিলেন, "বিন্দা পিসি! তোমাদের বল্লালসেন তো নরকের রাজা হইয়া বসিয়াছেন। নরকের সমুদায় বিষয়ের অধিকারী তিনি। তাঁর কাছে আমরা সকলে মিলিয়া স্থানের জন্য দরখাস্ত করিলে হয় না?"

আর একটী যুবতী বলিয়া উঠিল, "ঠিক বলিয়াছ, দিদি! সেই যে কুলীন-শিরোমণি এক রাত্রের মধ্যে বারোটী বিয়ে করিয়াছিল, ও একশো তেরটী অভাগীকে এক রাত্রে বিধবা করিয়াছিল, তার কোন পত্নীকে দিয়াই এই দরখাস্তটা পাঠান যাউক।"

পরে এক বাক্যে সকলেই বল্লালসেনের ও সেই কুলীন-শিরোমণির গোষ্ঠী-গোত্র ধরিয়া অজস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

একটা ঝি গালে হাত দিয়া এই সমুদায় অপূর্ব্ব কথা শুনিতেছিল। সকলকে এই রূপ গালি দিতে দেখিয়া সেও গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার গালাগালির সিন্দুক খুলিল। হাত-মুখ নাড়িয়া কহিল, "তাহার সর্ব্বনাশ হউক, সে শীঘ্র যমের বাড়ী যাউক" ইত্যাদি।

সকলে তাহার এই রূপ ভাব দেখিয়া হাসিয়া উঠিল।

বিন্দা দেবীর আর সহ্য হইল না। তিনি মুখ বিকৃত করিয়া কহিয়া উঠিলেন, "আ মর, মাগি! তুইও আবার ব্রাহ্মণকে গালি দিস্? মহাব্যাধি হইবে, খসে গলে মরিবি। বল্লালসেন তো অনেক কাল যমের পুরাণ হইয়া গিয়াছে। এখন তোরে যম ডাকিয়াছেন, নরকে দিবেন বলিয়া।"

ঝি সরোষে বলিল, "আছ আছ তুমি বামনী, তুমি আমাকে অমন মরার গাল দিবার কে?"

সকলে দেখিল গতিক ভাল নয়। ঝিকে বলিল, "যা যা, সন্ধ্যা হইয়াছে—কাজে যা।"

ঝি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কেন, গা! ও বামনী আমায় মরণের

গাল দিবে? ওর কি আমি খাই, না পরি?" এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেল।

শ্যামা ও স্নেহ এতক্ষণ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া এই সব ব্যাপার দেখিতেছিলেন ও শুনিতেছিলেন। গতিক মন্দ দেখিয়া সে ঘর হইতে অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যা অতীত হইতে দেখিয়া, বিন্দা দেবী, গমনকালে দুই একটী সম্ভাষণ করিয়া, গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সভা ভঙ্গ হইল। যে যার কার্য্যে চলিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

বিবাহ-প্রস্তাব।

মৃজাপুর। একটি পরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র কুটীরের একটি কক্ষে, একটি বালিকা রাঙ্গা-রাঙ্গা পদদ্বয় ছড়াইয়া, সুখের স্বপ্নে বিভোর হইয়া, আপন মনে, মৃদু-মৃদু হাসিতেছে, মৃদু-মৃদু গাইতেছে। বালিকার সম্মুখে একখানি ডালায় স্তূপাকারে সুগন্ধি পুষ্প রহিয়াছে। সুন্দর অঙ্গুলি দ্বারা বালিকা একটি একটি পুষ্প বাছিয়া বাছিয়া মালা গাঁথিতেছে। বালিকার করপদ্মসংস্পর্শে পুষ্পগুলি হীনপ্রভ বোধ হইতেছে।

এমন সময় দুইটি যুবা সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। একজন সস্নেহে ডাকিলেন, "মোহিনি!"

মোহিনী চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে অমৃতলাল ও সুনীলকুমার দাঁড়াইয়া। মোহিনী পদদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া মৃদু হাস্যের সহিত সলজ্জ-ভাবে চারুবদনখানি অবনত করিল।

অমৃতলাল কহিলেন, "এত সুন্দর করিয়া কাহার জন্য মালা গাঁথিতেছিস্?"

মোহিনী বলিল, "তুমি যে মালা ভালবাস, অনেক দিন তোমায় মালা গাঁথিয়া দেই নাই। কলিকাতায় কি তোমায় কেউ মালা গাঁথিয়া দেয় না, দাদা?"

বালিকা যখন এই কথাগুলি বলিতেছিল, তখন সুশীলকুমার মোহিত হইতেছিলেন। তিনি এমন সরলতাময় মধুর কথা কখনও শোনেন নাই। বালিকার নীলোৎপল-চক্ষু দুইটীর কোণে লজ্জা ও আনন্দমাখা হাসি ভাসিতেছিল।

অমৃতলাল হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "সেখানে কি তোর মত আমাকে কেউ ভালবাসে যে, মালা গাঁথিয়া দিবে? তুই সুশীল-কুমারের জন্য গাঁথিয়াছিস্ কই? তাকে একছড়া দিবিনি?"

বালিকা লজ্জায় আর মাথা তুলিতে পারিল না।

অমৃতলাল পুনরায় কহিলেন, "বল্, তাঁকে একছড়া দিবি কিনা?"

মোহিনী সম্মতিসূচক মাথা নাড়িল।

অমৃতলাল সস্নেহে মোহিনীর পৃষ্ঠ চাপড়াইয়া কহিলেন, "বেশ লক্ষ্মী মেয়ে, তার জন্য খুব সুন্দর করিয়া একছড়া গাঁথিস্।"

পরে সুশীলকুমারের একখানি হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "চল, ভাই, বাবার সঙ্গে দেখা করিয়া আসি।"

সুশীলকুমার অনিচ্ছার সহিত অমৃতলালের সঙ্গে তাঁহার পিতার কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় সুশীলকুমারকে দেখিয়া, আনন্দ সহকারে আপন পার্শ্বে বসাইয়া, নানা কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সুশীল-কুমার অবনত মুখে প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর চক্রবর্ত্তী মহাশয় সুশীলকুমারের হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "বাবা সুশীল! আমার মোহিনী তোমার দ্বারাই অসীম বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। তোমার সেই অসীম সাধুতার পুরস্কারস্বরূপ আমার

অমূল্য ধন মোহিনীকে তোমার পবিত্র হস্তে সম্প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছি, গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধের সহস্র আশীর্ব্বাদ লও।"

সুশীলকুমারের বোধ হইল, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকাণ্ড পৃথিবী যেন তাঁহার মস্তকের উপর একবার ঘুরিয়া গেল, শিরায় শিরায় শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল। কি উত্তর দিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। পাছে মনোভাব প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এই ভয়ে জড়সড় হইলেন।

অমৃতলাল তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া সহাস্যে মৃদুস্বরে কহিলেন, "মৌনং সম্মতিলক্ষণং।"

সুশীলকুমার নতশিরে কহিলেন, "পিতার মত পূর্ব্বে জানা কর্ত্তব্য।"

চক্রবর্ত্তী। অবশ্য আমি তাঁহাকে এ বিষয় কল্যই পত্রে লিখিব।

সুশীল। বাবার আজই এখানে আসিবার কথা আছে।

চক্রবর্ত্তী। তুমি কি এইখানেই কাজ আরম্ভ করিবে?

সুশীল। বাবা আসিলে ঠিক করিব।

তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে ইতিমধ্যে অমৃতলালের জননী আসিয়া আহার করিবার জন্য ডাকিলেন। বৃদ্ধ সুশীলকুমারের হস্ত ধরিয়া আহারের স্থানে লইয়া গেলেন। নানাপ্রকার কথাবার্ত্তায় আহার সমাপ্ত হইল। অমৃতলাল সুশীলকুমারের হস্ত ধরিয়া ছাদের উপর গিয়া উপবেশন করিলেন। তিনি মোহিনীসংক্রান্ত নানা কথা উত্থাপন করিয়া বুঝিলেন, সুশীলকুমার মোহিনীর নিকট হৃদয় হারাইয়াছেন। সুশীলকুমার ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "কি সুন্দর জ্যোৎস্না!"

এমন সময় মোহিনী কুঞ্চিত-কেশরাশি দোলাইতে দোলাইতে, গজেন্দ্রগমনে আসিয়া অমৃতলালকে মধুর স্বরে কহিল, "দাদা, এই মালা আনিয়াছি। আজ তত ভাল হয় নাই।"

"আজ বুঝি তুই অন্যমনস্ক ছিলি?" এই বলিয়া অমৃতলাল হাস্য করিয়া মালা গ্রহণ করিলেন।

মোহিনী লজ্জায় জড়সড় হইয়া ভাবিল, "বাঃ! দাদা তো বেশ মন বুঝিতে পারেন।"

অমৃতলাল মালা দেখিয়া বলিলেন, "তুই ছড়াই যে আমাকে দিলি? সুশীলকে দিলি না?"

মোহিনী ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র বদনখানি উত্তোলন করিয়া সুশীলকুমারের প্রতি চাহিল। দেখিল, সুশীলকুমার তাঁহারি প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন। চারি চক্ষের শুভ মিলন হইল। লজ্জায় মোহিনীর মৃগনয়ন নত হইল। সে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

অমৃতলাল দেখিলেন, সুশীলকুমার মোহিনীর গমনপথে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন। তিনি সুশীলকুমারের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন। সুশীলকুমার লজ্জিত হইলেন। অমৃতলাল হাসিয়া সুশীলকুমারকে মালা পরাইয়া কহিলেন, "এ মালা এখন তোমাকেই শোভা পাইবে, তুমিই পর।"

"তুমিই যে মালা বদল করিলে"—বলিয়া, সুশীলকুমার ঈষৎ হাসিলেন।

একজন ভৃত্য আসিয়া সুশীলকুমারকে কহিল, "আপনার বাড়ীতে আপনার পিতা আসিয়াছেন।

সুশীলকুমার গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, "তবে আজ যাই। তুমি কি কালই কলিকাতায় যাইবে ?"

অমৃত। কালই যাইব। আবার তোমার মালা-বদল দেখিতে বৈশাখ মাসে আসিব। তুমি মধ্যে মধ্যে এখানে আসিও।

সুশীলকুমার সহাস্যে কহিলেন, "তবে এখন আসি। চিঠি-পত্র লিখিতে ভুলিও না।"

সুশীলকুমার প্রস্থান করিলে অমৃতলাল স্বীয় অদৃষ্ট ভাবিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে শয়ন-কক্ষে গিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রোগ-শয্যা।

সুশীলকুমার আপন কক্ষে শয়ন করিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছেন, এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল, "আপনার জন্য একজন সন্ন্যাসী নীচে অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি বলিলেন, শীঘ্র আপনাকে প্রয়োজন।"

সুশীল কুমার সত্বর নীচে আসিয়া দেখিলেন—পূর্ব্বপরিচিত সেই যোগিবর তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। সুশীলকুমার সন্ন্যাসীর পদধূলি গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসী কহিলেন, "শীঘ্র আমার সঙ্গে আইস, বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

সুশীলকুমার দ্বিরুক্তি না করিয়া যোগিবরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাঁহারা ক্রমান্বয়ে সেই পূর্ব্বপরিচিত প্রান্তর ও পার্ব্বত্য পথ দিয়া যোগিবরের সেই কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সুশীলকুমার যোগীর আদেশে কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—সেই স্নেহের প্রতিমা যোগিনী একটী তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন! তাঁহার বদনমণ্ডলের সেই অমানুষিক জ্যোতিরাশি হীনপ্রভ বোধ হইতেছে। তাঁহার সেই চারুদেহলতা তৃণশয্যায় মিশিয়া যাইতেছে। তিনি সাংঘাতিক পীড়িতা। নিকটে সেই পূর্ব্বপরিচিত বালক গিরি সজলনয়নে যোগিনীর মুখের দিক তাকাইয়া রহিয়াছে।

যোগিবর নিকটে গিয়া ডাকিলেন, "মা সরোজ।"

যোগিনী নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন—সুশীলকুমার ম্লান বদনে দাঁড়াইয়া। যোগিনীর সেই শুষ্ক ম্লান বদনে ঈষৎ প্রফুল্লতা ভাসিল। যোগিনী সুশীলকুমারকে বসিতে সঙ্কেত করিলেন। সুশীলকুমার বিমর্ষচিত্তে যোগিনীর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। যোগিবর সে স্থান হইতে অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

যোগিনী ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "বৎস সুশীল! আজ আমার শেষ দিন। আমার শেষ আশীর্ব্বাদ তোমায় দিবার জন্য এত কষ্ট দিয়া তোমায় আনিয়াছি।"

সুশীলকুমার বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে যোগিনীর পবিত্র মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। যোগিনী ক্ষীণ স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"বৎস সুশীল! তুমি বোধ হয় জান, তুমি যখন দুই বৎসরের তখন তোমার পুণ্যবতী জননী ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পরে তোমার পিতা এই অভাগিনীকে বিবাহ করেন। বৎস! বাহ্য সৌন্দর্য্যে যেন কেহ কখন মুগ্ধ না হয়। পতঙ্গ যেমন দীপশিখার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আপন জীবন সেই অনলকুণ্ডে অর্পণ করে, আমিও তেমনি তোমার পিতার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে হৃদয় অর্পণ করিলাম।

"পিতা আমার দূরদর্শী বিজ্ঞ। তাঁহার আমি বই জগতে দ্বিতীয় কেহ ছিল না। আমিও এ জগতে পিতা বই আর কাহাকেও জানিতাম না। পিতাই পিতৃমাতৃস্থানীয় হইয়া অসীম স্নেহে আমায় পালন

করিতেন।—আহা! আমি পিতার অধম সন্তান। জন্মিয়া অবধি পিতাকে অশেষ ক্লেশ দিয়াছি!

"তোমাদের এক গ্রামে আমাদের বাড়ী ছিল। তোমার পিতা প্রায়ই আমাদের বাড়ী আসিতেন। তিনি পিতার নিকট আমাকে বিবাহের অভিপ্রায় জানাইলেন। পিতা প্রথমে অস্বীকৃত হইলেন, পরে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া আমায় ডাকিয়া কহিলেন, "মা সরোজ! অক্ষয়কুমারের বাহ্য সৌন্দর্য্যে মোহিত হইও না। তাহার সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলে।" আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম, লজ্জা ত্যাগ করিয়া কহিলাম, "সে সমুদয় মিথ্যা।" তখন আমার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসরের অধিক হইবে না। আমি জানিতাম না যে, মনোহর কুসুমেও কীট থাকে। পিতা আমার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া, বিবাহ দিয়া, যাহা কিছু ছিল বিবাহে যৌতুক দিয়া, নিশ্চিন্ত মনে, ধর্ম্মার্জ্জন মানসে কাশীধামে প্রস্থান করিলেন।

"আমি কিয়ৎ দিবস স্বামীর আদরে, মনের সুখে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। কিন্তু অভাগিনী বিমাতা! কে কবে সুখী হইয়াছে? প্রাণপণ করিয়াও কে কবে যশোলাভ করিয়াছে? আমার অদৃষ্টে অনেক দিন আর স্বামীসোহাগ সহিল না। প্রাণের সহিত তোমায় লালন-পালন করিতে লাগিলাম। তাহাতেও নানা জন নানা কথা কহিত ও নানাপ্রকার বিদ্রূপ করিত। আবার তোমার কোন দোষহেতু একটু শাসন করিলে বলিত, "আহা সোণার চাঁদ ছেলেকে রাক্ষসী কবে মারিয়া ফেলিবে! সাপিনীকে গৃহে আনিয়া অবধি বাছার সমুদয় সুখ ফুরাইয়াছে। আহা! ওর

মা থাকিলে কি আজ ওর অমন দশা হইত! বাছার কত আদর হইত!" আবার তুমি বালস্বভাবহেতু কাহারও কোন অনিষ্ট করিলে, আমায় গালি দিয়া কহিত, "বিমাতা মন্দ হইলে তার আর কি ভালাই হয়? তাই শাসন না করিয়া ছেলেটার সর্ব্বনাশ করিয়াছে।" অভাগিনী বিমাতা হইয়া সহ্য করিতেই জন্মিয়াছিলাম, নীরবে সকলি সহ্য করিতাম। ক্রমে ক্রমে তুমি নয়-দশ বৎসরের হইলে লোকে তোমার পবিত্র সরল মনে নানাপ্রকার কূট শিক্ষা দিতে লাগিল। তুমিও তাহাদের পরামর্শে বালকস্বভাব-প্রযুক্ত অভাগিনীর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে লাগিলে!

'অবশেষে স্বামীও আমাকে বিষ-নয়নে দেখিতে লাগিলেন। হায়! দুঃখিনীর জগতে আর কেহই নাই। শিশুকালে অজ্ঞানাবস্থায় মাতার মৃত্যু হয়, মাতার স্নেহ কিরূপ জানি না। যে দেবস্বরূপ পিতার স্নেহে বর্দ্ধিতা হইয়াছিলাম সেই পিতা স্বামীর গৃহে রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিরুদ্দেশ হইলেন। হতভাগিনীর মুখের প্রতি একবার করুণ দৃষ্টি করে, এ জগতে এমন আর কেহই নাই। সমুদয় জগত দুঃখিনীর প্রতি বিমুখ হইল। ক্রমে স্বামীর এত অপ্রিয় হইলাম যে, দেখা হইলেই বিনা কারণে দশবার তিরস্কার করিতেন। স্বামী দেবতা, আমার অদৃষ্টদোষেই সমুদয় ঘটিয়াছিল। তাঁহার কথা আর কত বলিব। পিতার নিকটে যে সকল দোষের কথা শুনিয়াছিলাম, তৎসমুদায়ই সত্য বলিয়া ক্রমে জানিতে পারিলাম। অভাগিনীর কেহ নাই, কার কাছে কাঁদিব? অন্তর্যামী ভগবানের কাছে কাঁদিয়া কথঞ্চিৎ শান্ত হইতাম। বাবা সুশীল! তোমার বোধ হয় মনে পড়ে, তোমায় আমি বিরলে

পাইলেই নানাপ্রকারে বুঝাইতাম। তুমিও সকলের কুমন্ত্রণা ভুলিয়া সদয় হইতে। কিন্তু আমার সহিত কথা কহিয়াছ শুনিয়া তাহারা তোমায় আরও অধিক কুমন্ত্রণা দিত। অবশেষে এমন ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক কুৎসা আরম্ভ করিল যে, আমার বাড়ীতে অবস্থান করা একেবারেই অসাধ্য হইয়া উঠিল। স্বামীর তিরস্কার এত অসহ্য হইল যে, আত্মহত্যা যে মহাপাপ তাহাও সময়ে সময়ে স্মরণ থাকিত না।

"এইরূপে সাত-আট বৎসর কাটিয়া গেল। অকস্মাৎ তোমার সাংঘাতিক পীড়া হইল। ব্যাকুল হইয়া প্রাণপণে তোমার শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। তোমার পীড়া হইল তাহাও যেন আমার অপরাধ! আমায় সকলেই নানারূপ কুবাক্যে তিরস্কার করিত। একদিন তোমার পিসিমা মুখ আরক্তিম করিয়া আমায় অকারণ কহিতে লাগিলেন, "রাক্ষসি, তুই আসিয়া অবধি বাছার এক দিনও রোগ ছাড়ান নাই। নিশ্চয়ই তুই বাছাকে কি খাওয়াইয়াছিস্।" আমি শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। ভগবানের নিকট তোমার আরোগ্যের জন্য কতই প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, তুমি আরোগ্য হইলেই পিতার উদ্দেশে প্রস্থান করিব। দেবতার প্রসাদে শীঘ্রই তুমি আরোগ্য লাভ করিলে।

"তোমাদের বাড়ী হইতে হাবড়া ষ্টেসন অতি নিকট ছিল। আমি অনাথা, বাইস বৎসর বয়সের সময়, অনাথনাথ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া, এক দিন গোপনে পিতার উদ্দেশে বারাণসী প্রস্থান করিলাম। অঙ্গে যে সামান্য দুই একখানি অলঙ্কার ছিল তাহা

খুলিয়া বাক্সে রাখিলাম। সামান্য একখানি মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া, পিতার প্রদত্ত অর্থ হইতে সামান্য কিছু লইয়া, অজস্র অশ্রু-বর্ষণ করিতে করিতে, রেলগাড়ীযোগে প্রস্থান করিলাম। আমার প্রস্থানের কথা তোমার কিছু-কিছু স্মরণ থাকিতে পারে। তখন তুমি একাদশ বর্ষের বালক।”

যোগিনীর শীর্ণ কলেবর কাঁপিতে লাগিল। যোগিনী আর কথা কহিতে পারিলেন না। সুশীলকুমার এতক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে এই দুঃখময় কাহিনী শুনিতেছিলেন। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, ব্যাকুল হইয়া যোগিনীর পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, “মা, আমি অধম, ক্ষমার অযোগ্য পুত্র। তোমার চরণে কত অপরাধ করিয়াছি—আমাকে ক্ষমা কর।”

যোগিনীর হৃদয়ে এই আনন্দরাশি ধারণ করিবার শক্তি হইল না। যোগিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সুশীলকুমার ব্যস্ত হইয়া মূর্চ্ছা অপনয়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন ইতিমধ্যে যোগিবর কুটীর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া যোগিনীর অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া কাতর হৃদয়ে কহিলেন, “মা সরোজ! ইহকালের জন্য কি আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিলে?”

সুশীলকুমারের শুশ্রূষায় ও যোগীর গম্ভীর আহ্বানে যোগিনীর জ্ঞানসঞ্চার হইল। তিনি নেত্র উন্মীলন করিয়া কহিলেন, “বাবা! শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে।—বৎস সুশীল! স্বামী দেবতা। এই শেষ সময়ে একটিবার তাঁহার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিতে পারিলাম না—এই দুঃখ রহিল। নতুবা আর কোন দুঃখ নাই। তুমি

আমায় অন্তিম সময়ে বড় সুখী করিলে—আশীর্ব্বাদ করি, সাধু ও সুখী হও।”

সুশীলকুমার কহিলেন, “পিতা এইখানেই আছেন, অনুমতি হইলে আমি এখনই গিয়া তাঁহাকে আনিতে পারি।”

যোগিনী যোগিবরের প্রতি করুণ ভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন। যোগিবর তাঁহার ভাব বুঝিয়া সুশীলকুমারকে অনুমতি প্রদান করিলেন।

যোগিনী কহিলেন, “বৎস! তোমার যাইবার প্রয়োজন নাই। বাবা, আমাদের গিরিকে প্রেরণ করুন।”

সুশীলকুমার কহিলেন, “আমার নিকট লিখিবার উপকরণ আছে, আমি একটু লিখিয়া দিই।”

সুশীলকুমার তাঁহার পিতাকে লোকসহিত অতি সত্বর আসিতে লিখিয়া দিলেন। যোগিবর গিরিকে তৎক্ষণাৎ প্রেরণ করিলেন। যোগিনী পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন,—

“বৎস! আমি কাশীধামে আসিয়া পিতার অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। পাছে কোন দুষ্ট লোকের মন্দ-চক্ষে পড়ি এই আশঙ্কায় মস্তক মুণ্ডন করিলাম এবং শরীরে ভস্ম মাখিয়া পাগলিনীর ভাণ করিয়া, বহু কষ্টে এক সপ্তাহ দিন-যামিনী পথে পথে রোদন করিয়া কাটাইলাম। এক দিন প্রাতঃকালে হতাশ অন্তরে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিতেছি, পথে পিতার সাক্ষাৎ পাইলাম।

“আমি পিতার চরণ ধারণপূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিলাম। পিতা আমায় চিনিতে পারিয়া ও আমার দুঃখের বেশ দেখিয়া কাঁদিতে

লাগিলেন। পরে আমি আমার দুঃখের কাহিনী সমুদয় নিবেদন করিলাম। পিতা মধুর বচনে আমায় সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। আমি পিতার সান্ত্বনায় আনন্দিত হইয়া সমুদয় দুঃখ দূর করিলাম। সেই অবধি পিতার সঙ্গে বিন্ধ্যাচলে আসিয়া, পরমানন্দে দেবাদি-দেবের আরাধনায় রত হইয়া, কৃতার্থ হইয়াছি। তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, বাবা! সকল দুঃখের মহৌষধ, সকল সুখের আকর ধর্ম্মধন অর্জ্জন করিয়া অনন্ত কালের জন্য সুখী হও।"

যোগিনী আর বলিতে পারিলেন না। দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সুশীলকুমার ব্যাকুল হৃদয়ে জননীর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

—*—

দেহত্যাগ।

লিপি প্রাপ্তিমাত্র অক্ষয়কুমার সেই প্রেরিত বালকের সহিত চলিলেন। যাইতে যাইতে তাঁহার হৃদয়ে নানা বিষয়ের আন্দোলন হইতে লাগিল। এ ঋষিবালক কে? সুশীলকুমার ইহাদের আশ্রমে গিয়াছে কেন? আমাকে যাইবার জন্যই বা এত বিশেষ করিয়া লিখিয়াছে কেন? বালকের নিকট দুই একটি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন প্রশ্নেরই সদুত্তর প্রাপ্ত হইলেন না। অক্ষয়কুমার নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে সেই পূর্ব্ববর্ণিত পর্ব্বত-পথ দিয়া যোগীর কুটীরে উপস্থিত হইলেন। কুটীর-দ্বারে বৃদ্ধ যোগিবরকেঁ দেখিয়া অক্ষয়কুমার চমকিয়া উঠিলেন!

যোগিবর গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "ভয় নাই, কুটীরে প্রবেশ কর।"

অক্ষয়কুমার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, সভয়ে কুটীরে প্রবেশ করিয়া শয্যাগতা যোগিনীকে দেখিবামাত্র হতজ্ঞান হইলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। সুশীলকুমার পিতার ভাব দেখিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। তৎপরে যোগিনীর প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, তিনি আবার মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন। সুশীলকুমার ব্যস্ততা সহকারে যোগিনীর মূর্চ্ছাপনয়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অক্ষয়কুমার বিস্মিত চিত্তে কহিলেন, "ব্যাপার কি ?

ইতিমধ্যে যোগিনীর জ্ঞানসঞ্চার হইল। তিনি ক্ষীণ স্বরে কহিলেন, "জল।"

সুশীলকুমার সযত্নে জল প্রদান করিতে লাগিলেন।

যোগিনী অক্ষয়কুমারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "স্বামিন্! আমায় কি চিনিতে পার নাই ? আমি তোমার চিরদুঃখিনী সরোজ। অভাগিনীকে দেখিয়া কি আশ্চর্য্য হইয়াছ ? হতভাগিনী মরে নাই, তোমার সরোজ অবিশ্বাসিনীও নয়।"

যোগিনীর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। অক্ষয়কুমারের শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল। তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে কহিতে লাগিলেন, "সরোজ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। স্বাধ্বি, আমায় ক্ষমা করিবে না ?"

যোগিনীর এত সুখ সহ্য হইল না। তাঁহার ভাগ্যে স্বামীর এইরূপ সম্বোধন ঘটে নাই। তাঁহার নিকট সমুদায় পৃথিবী ঘূর্ণায়মান বোধ হইতে লাগিল। দুর্ব্বল শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। তিনি পুনরায় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। অক্ষয়কুমার অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে যোগিনীর চেতনা হইল। তিনি নেত্র উন্মীলন করিয়া আবার জল চাহিলেন। সুশীল সযত্নে জল প্রদান করিলেন।

অক্ষয়কুমার অশ্রু মুছিয়া কহিলেন, "সরোজ! এতদিন আমায় তোমার সংবাদ দেও নাই কেন ? আমি তোমার কত অন্বেষণ করিয়াছিলাম। আমি জানিতাম তুমি পবিত্রা, কখন তোমাতে পাপ স্পর্শ করিবে না।"

ইতিমধ্যে যোগিবর কুটির-মধ্যে প্রবেশ করিয়া পরাক্ষায় জানিলেন, আর বেশি বিলম্ব নাই, যোগিনীর স্বর্গারোহণের সময় নিকট। সরোজ যোগিবরকে ক্ষীণ-স্বরে কহিলেন, "পিতঃ! আর যে দেখিতে পাইতেছি না। আমি চলিলাম, পবিত্র পদধূলি আমায় প্রদান করুন।"

সরোজ হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক যোগিবরের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন এবং পুনর্ব্বার অক্ষয়কুমারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "স্বামিন্! মনের সাধ মনেই রহিল, ইহজন্মে তোমার পদসেবা করিয়া কৃতার্থ হই নাই, আশা করি লোকান্তরে এই সাধ পূরিবে।"

তৎপরে ক্ষুদ্রহস্তখানি প্রসারণ করিলেন। অক্ষয়কুমার নিকটেই বসিয়াছিলেন, সরোজ পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক মস্তকে দিলেন। হায়! মস্তক হইতে আর সে মৃণালনিন্দিত হস্তখানি নামিল না। স্ফুরিত ওষ্ঠদ্বয় মুদ্রিত হইয়া আসিল, তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না। চিরদিনের মত সেই সুধামাখা স্বর রুদ্ধ হইল, কোমল-নেত্রদ্বয় ক্রমে নিমীলিত হইয়া আসিল। সরোজের পবিত্র প্রাণবিহঙ্গ নানা ক্লেশ উপভোগ করিয়া অক্ষয়শান্তিধামে চলিয়া গেল!

যোগিবর গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "যাও, মা! জরা-মৃত্যু-শোক-দুঃখরহিত অনন্ত সুখের আগারে অনন্তশান্তিধামে চলিয়া যাও।" পরে অক্ষয়কুমারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "যাও, সাধ্বীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন কর।" এই বলিয়া সত্বর সে স্থান হইতে অদৃশ্য হইলেন।

অক্ষয়কুমার সরোদনে সুশীলকুমারকে কহিলেন, "যাও, বৎস! চিতা প্রস্তুত কর! ওঃ স্বপ্নের ন্যায় সব ফুরাইয়া গেল।"

সুশীলকুমার ভাগিরথীতীরে চিতা সজ্জিত করিয়া আসিলেন। তৎপরে পিতা-পুত্রে শববহনপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া গেলেন। সুশীলকুমার অশ্রু মুছিয়া কহিলেন, "বাবা! মৃত শরীরের এত জ্যোতি তো কখন দেখি নাই। মার সকলি অলৌকিক!"

অনন্তর চিতামধ্যে সেই পবিত্রসৌন্দর্য্যময় দেহলতা অর্পিত হইল। অল্পক্ষণ মধ্যে সোণার দেহ ভস্মসাৎ হইয়া গেল। রজনী প্রভাত হইল; চতুর্দ্দিকে লোককোলাহল শ্রুত হইতে লাগিল; পৃথিবী-সুন্দরী নূতন শোভা ধারণ করিলেন; উভয়ে শোকসন্তপ্তচিত্তে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

সরোজের অন্তিম সময়ের পবিত্রবাক্যগুলি ও পবিত্রভাবসমূহ চিরদিনের জন্য পিতা-পুত্রের হৃদয়ে জাগরূক রহিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। নিশানাথ স্বকীয় বিমল কিরণ বিতরণপূর্ব্বক যাবতীয় তরুলতা ও অট্টালিকা প্রভৃতিকে যেন শুক্লাম্বরে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। সমুদয় প্রকৃতি সেই সুন্দর শোভায় প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। রাজপথে আর কোন প্রাণীর পদসঞ্চার-শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে না। পশু, পক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় জীব-জন্তু নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। কেবল মধ্যে মধ্যে এক এক বার মন্দ-মন্দ-সমীরণভরে তরুলতা-পল্লবাদি মর্ম্মর-শব্দে পরিচালিত হইতেছে। যেমন দীপশিখা দিবাকর-কিরণে মন্দপ্রভ হয়, সেইরূপ খদ্যোতপুঞ্জ নিশাকরকিরণে হীনপ্রভ হইয়া শূন্যমার্গে ও বৃক্ষশাখায় বিহার করিয়া বেড়াইতেছে।

মৃজাপুরের একটি কক্ষমধ্যে একটি যুবা পাদচারণা করিতেছেন। যেন কোন মর্ম্মান্তিক যাতনা যুবার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে। যুবা অনেক ক্ষণ পরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক একবার চতুর্দ্দিক অবলোকন করিলেন। তৎপরে কি মনে করিয়া ধীরে ধীরে পরিষ্কৃত শয্যার উপর তাঁহার অতুলরূপরাশি ঢালিয়া শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে যুবার নিদ্রাকর্ষণ হইল।

পাঠক অবশ্যই অমৃতলালকে চিনিতে পারিয়াছেন। অমৃতলাল গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। তিনি নিদ্রাবশে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তাঁহার স্নেহের পুত্তলী স্নেহলতা হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ ঘোর অরণ্যে বাস করিতেছেন। সেই ভয়ঙ্কর অরণ্য হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ব্যাকুলচিত্তে পথ অন্বেষণ করিতেছেন, কিন্তু কোথাও পথ না পাইয়া, অতি কষ্টে সেই কোমল ক্ষুদ্র হস্ত দিয়া, কণ্টকলতা ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এমন সময় একটা দুর্দ্দান্ত কালসর্প তাঁহাকে দংশনের জন্য ফণা তুলিল। তিনি ব্যাধতাড়িতা হরিণীর ন্যায় কাতরচিত্তে সভয়ে দৌড়িতে লাগিলেন। সেই ভয়ানক সর্প তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল। বালিকা ক্লান্ত হইয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! সে যে অরণ্যে রোদন! কেহই তাঁহাকে সেই ভীষণ সর্পের হস্ত হইতে রক্ষা করিল না, কেহই তাঁহাকে অভয় দান করিল না। তখন বালিকা মনে করিল, "আমার তো কেহই নাই, তবে আর কাহার জন্য এত ক্লেশে জীবন রাখিব?" হঠাৎ বালিকার স্মরণ হইল, তাঁহার অতি সুহৃদ্ এমন একজন আছেন, যাঁহাকে তিনি অসীমক্ষমতাশালী মনে করেন। বালিকা তখন কাতর-চিত্তে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। অবশেষে সেই ননীর পুতলী, "অমৃতলাল! তুমিও অভাগীকে ভুলিয়া গিয়াছ? উত্তর দিলে না? রক্ষা করিলে না?" এই বলিয়া ভূতলে ঢলিয়া পড়িলেন। অমনি সেই ভয়ানক কালসর্প তাঁহার কোমল অঙ্গে দংশন করিল। আহা! দেখিতে দেখিতে সেই সোণার অঙ্গ কালিমাকৃতি ধারণ করিল।

অমৃতলাল যেমন "ভয় নাই," "ভয় নাই," বলিয়া ধাবমান হইবেন, অমনি তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

নিদ্রাভঙ্গে তাঁহার সমস্ত শরীর অবসন্ন হইতে লাগিল, হৃদ্‌পিণ্ড ভয়ানকরূপে স্পন্দিত হইতে লাগিল, তালু শুষ্ক হইয়া গেল, ঘন-ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। স্বপ্নবৃত্তান্ত মুহুর্মুহুঃ স্মরণ হওয়ায় তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। এমন কি সেই শিক্ষিত বীর অবশেষে বালকের ন্যায় রোদন করিয়া ফেলিলেন! যাতনা অসহ্য বোধ হইল। তখন তিনি অস্থিরভাবে শয্যাপরিত্যাগপূর্ব্বক বাতায়ন-সন্নিধানে গিয়া দেখিলেন, রজনী প্রভাত হইয়াছে। পূর্ব্বাকাশের আলোক ধীরে ধীরে সমুদয় আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছে। মলিন গগনে এখনও দুই একটি তারা উঁকি মারিতেছে। মৃদু প্রাতঃসমীরণ প্রবাহিত হইয়া সমুদয় প্রাণীকে স্নিগ্ধ করিতেছে। দুই একটি বিহঙ্গ স্বীয় কুলায় ত্যাগ করিয়া, আনন্দে প্রভাত ঘোষণা করিতে, করিতে দিগ্‌দিগন্তরে ধাবিত হইতেছে।

অমৃতলাল দেখিলেন, সমুদয় প্রকৃতি পূর্ব্ববৎ শোভাসম্পন্ন রহিয়াছে—কেবল তিনি আর সে রূপ নাই। তিনি আজ প্রকৃতির একেবারে বিপরীত দিকে স্থাপিত হইয়া পড়িয়াছেন। সমুদয় জগৎটা অমৃতলালের কেমন বিষাদময় বোধ হইতে লাগিল। তিনি আর সে গৃহে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। অধীর চিত্ত শান্ত করিবার জন্য, সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যানে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে চারি দিক কোলাহলপূর্ণ হইল। দেখিতে দেখিতে গৃহের সমস্ত লোক শয্যা ত্যাগ করিয়া নিত্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

অমৃতলাল পিতামাতার নিকট বিদায় লইয়া, সস্নেহে মোহিনীকে দুই-একটি আদরের কথা শুনাইয়া, কলিকাতা যাইবার জন্য ট্রেনে উঠিলেন। পরদিন যথাসময় কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিলেন। তৎপরে একখানি গাড়ী করিয়া সত্বর বরাহনগরে গমন করিলেন। সেখানে আসিয়া দেখিলেন, হীরালাল তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া পত্র লিখিতেছেন।

হীরালাল অমৃতলালকে দেখিবামাত্র অতি আনন্দসহকারে বলিয়া উঠিলেন, "তবু ভাল, আমি বলি বুঝি আমাদের একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছ। একখানি চিঠিও কি লিখিতে নাই। আমি এই তোমাকে পত্র লিখিতেছিলাম। বাড়ীর সব ভাল তো?"

অমৃতলাল সহাস্যে উত্তর করিলেন, "হাঁ, তা সব ভাল। এখানকার সব ভাল তো?"

হীরালাল বলিলেন, "হাঁ, এখানকার সব ভাল। চল, এখন বাড়ীর ভিতর যাওয়া যাক্।"

উভয়ে অন্তঃপুর-মধ্যে গেলেন। উষাবতী অমৃতলালকে দেখিয়া, সহাস্য-বদনে আসন প্রদান করিয়া, কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অমৃতলাল হৃদয়প্রতিমা স্নেহকে না দেখিতে পাইয়া শূন্য হৃদয়ে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ মনোভাব গোপন করিতে অসমর্থ হইয়া, ভীত অন্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্নেহ কোথায়?"

হীরালাল কহিলেন, "পিসামহাশয়ের পীড়া হওয়ায় স্নেহের খুল্লতাত আসিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া গিয়াছেন।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে অমৃতলালের মনে গত-পূর্ব্ব রাত্রের সেই ভয়ানক স্বপ্নবৃত্তান্ত স্মরণ হইল। অনেক ক্ষণ অবধি অমৃতলালের কথা কহিবার শক্তি রহিল না। অনেক ক্ষণ অবধি কত ভাবনার স্রোত তাঁহার সন্তপ্ত হৃদয়ে ক্রমান্বয়ে বহিয়া গেল। অমৃতলাল স্পষ্টরূপে যেন আপন অদৃষ্টের পরিণাম বুঝিতে পারিলেন। মানুষ একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে কতক পরিমাণে আশ্বস্ত হয়। অমৃতলাল কিছু পরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, "কত দিন গিয়াছেন?"

হীরালাল বলিল, "প্রায় সাত মাস হইল। বাবা নিজে তাঁহাদিগকে আনিতে যাইবেন বলিয়া বোট ঠিক করিয়াছিলেন। আমি অনেক বলিয়া কহিয়া তাঁহার যাওয়া বন্ধ করিয়াছি। আমিই কালই তাঁহাদের আনিতে যাইব। কি বলিব, ভাই! চিঠিখানা পর্য্যন্ত তাঁহাদের লিখিতে দেয় না। বাবা লোকমুখে তাঁহাদের কষ্টের কথা শুনিয়া নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। পিসিমার কষ্ট তিনি কখন দেখিতে পারেন না। আর আমাদের সংসার পিসিমা ভিন্ন এক দণ্ডও চলে না। মা তো সর্ব্বদাই পীড়িতা।"

অমৃতলাল নীরবে হীরালালের কথাগুলি শুনিতেছিলেন। ইতিমধ্যে উষাবতী, একখানি রৌপ্যময় পাত্রে নানাবিধ খাদ্য আনিয়া, অমৃতলালকে কহিলেন, "একটু জলযোগ কর।"

অমৃতলাল উষাবতীর সম্মানরক্ষার জন্য একটু শুষ্ক হাস্য করিয়া জলযোগে বসিলেন, কিন্তু কিছুই খাইতে পারিলেন না। একটি পরিচারিকা রৌপ্যময় পাত্রে কতকগুলি তাম্বুল আনিয়া দিল। অমৃতলাল একটী তাম্বুল হস্তে হইয়া বিনীতভাবে কহিলেন, "তবে আজ যাই।"

হীরালাল তাঁহার মনের কষ্ট বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে থাকিবার জন্য আর অনুরোধ করিলেন না।

অমৃতলাল তাঁহাকে কহিলেন, "আজ যাই, তুমি ফিরিয়া আসিলে আবার আসিব।" এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

হীরালাল একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "কি অকৃত্রিম ভালবাসা! কিন্তু বোধ হয় এই ভালবাসার পরিণাম বড়ই ভয়ানক।"

উষাবতী হীরালালের কথার মর্ম্ম বুঝিলেন, স্নেহের সেই সুধাংশু-বদনখানি মনে পড়িল। তাঁহার সেই সরলতাময় অমিয়কথাগুলি মনে পড়িল। দেখিতে দেখিতে উষার সেই কৃষ্ণ-নয়ন-দুটি অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। উষা শয্যায় মুখ লুকাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে এইরূপ রোদন করিতে দেখিয়া হীরালালেরও নয়ন শুষ্ক রহিল না। পর দিন হীরালাল, লোকজন সঙ্গে লইয়া, শ্যামা ও স্নেহকে আনিতে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

—*—

লিপি।

অমৃতলাল ভগ্ন ও বিষণ্ণ হৃদয়ে কলিকাতায় আপন বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। সন্ধ্যা সমুপস্থিত। অমৃতলালের তৎপ্রতি কিছু মাত্র লক্ষ্য নাই। তাঁহার হৃদয়-জগতে যে ঘোরতর আঁধার সমাগত, তিনি তাহাতেই সমাচ্ছন্ন। তিনি এমন ভাবে আপনহারা হইয়াছেন যে, বাহ্য জগতের কোন প্রকার ভাব, কোন প্রকার ঘটনাই তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে না। তিনি আপন শয্যায় শুইয়া মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিলেন। কত প্রকার চিন্তাই যে তাঁহার হৃদয় দিয়া বহিয়া যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ তিনি ভাবিতেছেন, তিনি মনুষ্যত্বহীন। তিনি কেন জগতে আসিলেন? তাঁহাকে জগতে পাঠাইবার উদ্দেশ্য কি? তাঁহাকে দিয়া জগতের কোন কাজই হইতে পারে না। তাঁহার তো কোন প্রকার শক্তি-সামর্থ্য নাই। আবার ভাবিলেন, সত্যই কি আমার শক্তি নাই?—না তাহা তো নয়, আমার যে অনেক শক্তি, অনেক তেজ, অনেক উদ্দেশ্য। স্নেহের সেই বিমল-মুখচন্দ্র ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয়পটে উদিত হইল। তাঁহার সেই মধুমাখা কথাগুলি একে একে মনে হইতে লাগিল। তাঁহার সেই সরল ভাবগুলি হৃদয়ে উপস্থিত হইল। আবার তখনি মনে হইল, সেই

সুধাময়ী স্নেহলতা তো এখন আর তাঁহার নয়। তিনি এখন কোন ভাগ্যবান্ পুরুষের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন!

অমৃতলাল অধীর হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাঁহার যে শক্তিটুকু সঞ্চিত হইয়াছিল, যে সাহসটুকু পাইয়াছিলেন, তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইল। তিনি সরোদনে ক্ষিপ্তের ন্যায় বলিতে লাগিলেন, "স্নেহ আমার, তুমি আমার বল, তুমি আমার শক্তি। তোমা ছাড়া আমি যে কিছুই না—তবে তোমা বিহনে আমি কি করিয়া তিষ্ঠিব?"

কথা কয়টি উচ্চারণের পরক্ষণেই কে যেন অতি মধুর স্বরে তাঁহাকে বলিল, "শান্ত হও—প্রকৃতিস্থ হও—কি করিতেছ? এই কি তোমার জীবনের উদ্দেশ্য?"

এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহার যেন নবজীবন সঞ্চার হইল। তখন তিনি আপনাকে আপনি ধিক্কার দিলেন। তিনি আপনার হীনতা অনুভব করিয়া লজ্জিত হইলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, "এই না আমি ভাবিয়া থাকি—আমার প্রেম স্বার্থশূন্য? ছিঃ, অমন স্বর্গের দেবীকে আমি পার্থিব সুখের জন্যই এত দিন ভালবাসিয়া আসিয়াছি! ধিক্ আমাকে! স্নেহ অন্যের হইয়াছে হউক —ছিঃ, আমি এত অধীর হইয়া পড়িয়াছি! আমি এত দুর্ব্বল! পরমেশ্বর তোমার দাসকে রক্ষা কর, তোমারই উপর নির্ভর করিতে ও তোমার কাজ করিতে শক্তি দেও।"

পুনরায় তাঁহার শক্তি আসিল। তিনি কি যেন একটা বলে বলীয়ান্ হইয়া সহসা স্থির ও প্রকৃতিস্থ হইলেন। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন—রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। পার্শ্বে

একটি বাতী জ্বলিতেছে। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া, আসনে উপবিষ্ট হইয়া, একাগ্রচিত্তে আপন এস্রাজ্‌টি ধীরে ধীরে বাজাইতে লাগিলেন, ও তৎসঙ্গে আপন সুমিষ্ট স্বর মিলাইয়া হরিগুণ-গানে মত্ত হইলেন। গাহিতে গাহিতে তাঁহার বদনমণ্ডলে অপূর্ব্ব জ্যোতি ভাসিয়া উঠিল, দুইচক্ষুবাহী প্রেমাশ্রু দেখা দিল, সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, পুলকে হৃদয় নৃত্য করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কি এক অপূর্ব্ব ভাবে অমৃতময়-প্রেমরস-পানে তিনি বিভোর হইয়া পড়িলেন। ক্রমে ক্রমে গীত-সুধা মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া আসিল। হস্তের শিথিলতা-প্রযুক্ত হস্তস্থিত যন্ত্র খসিয়া পড়িল। অশ্রুসিক্ত নয়নদ্বয় ক্রমে শুষ্ক হইল। কেবল সেই আয়ত-নয়নযুগল কি এক অব্যক্ত প্রেমভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অমৃতলাল অমৃতময় হরিপ্রেমামৃত-পানে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পবিত্র-মুখারবিন্দে হাস্যের উদয় হইল। কিছুক্ষণ পরে সুস্থচিত্তে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক, পুনরায় স্থিরভাবে কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে অমৃতলাল একখানি কাগজ লইয়া কি লিখিলেন। আবার কি মনে করিয়া কাগজখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। অনেক ক্ষণ বসিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। পুনর্ব্বার এক খানি কাগজ লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন,—

"আমার স্নেহ!

তুমি কি এখন আর আমার নও? কে বলিল, তুমি আমার নও? অনেক চেষ্টা করিয়া তো আমি ভাবিতে পারি নাই যে, তুমি

এখন আমার নও—অন্যের! স্নেহ! সত্যই কি এখন তুমি অন্যের হইয়াছ? যদিই বা তুমি অন্যের হইয়া থাক তাহাতেই বা আমার কি?—আঃ! কি লিখিতে কি লিখিতেছি! স্নেহ, আমি জানি তুমি আমাকে অতিরিক্ত স্নেহ কর—আমি অতি ভাগ্যবান্। এ জগতে যদি আমার কিছু স্পৃহণীয় থাকে তাহা তুমি, যদি কিছু আনন্দের বিষয় থাকে তাহা তোমার সুধাংশু-বদন, যদি কিছু সুখ থাকে তাহা তোমার হাস্যমিশ্রিত মধুমাখা কথা। জানি না, আমি আজ যে বিষয় অনুরোধ করিতে বসিয়াছি, তাহা তোমার প্রীতিপ্রদ হইবে কি না; তাহা তুমি অন্তরের সহিত অনুমোদন করিবে কি না; তাহাতে তোমার মর্ম্মে আঘাত লাগিবে কি না। কিন্তু কি করিব? তোমার প্রতি অচলা প্রীতি, আজ আমাকে পরামর্শ দিতেছে। তাই না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না।

স্নেহ! আমি অতি কাতরচিত্তে তোমায় বলিতেছি—আমাকে সুখী করিবার জন্য তুমি মনকে দৃঢ় কর। 'মনকে দৃঢ় কর' বলিতেছি—কিন্তু বড় কঠিন। স্নেহ! আমি বিশ্বাস করি, তুমি আমার সুখের জন্য সকলি করিতে পার। স্নেহ! আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া আমাকে সুখী করিবে না? তোমাকে যে অনুরোধ করিব বলিয়া এত লিখিলাম, কৈ তাহা এখনও লিখিতে পারিলাম না কেন? মুহুর্মুহুঃ বড় ভয় হইতেছে, পাছে তোমার কোমল হৃদয়ে আঘাত লাগে! স্নেহ! তুমি যে পুষ্প হইতেও কোমল। কিন্তু আবার ভাবি, তুমি আমার জন্য পর্ব্বতাকারক্লেশরাশি ঐ কুসুম-কোমল হৃদয়ে অক্লেশে বহন করিতে পারিবে।

স্নেহ আমার, তুমি আমার জন্য ভাবিও না। তুমি সুখী হইলেই আমি সুখী হইব। তুমি আমার অনুরোধ শুন। চিত্ত সুস্থির করিয়া, যে ভাগ্যবান্ পুরুষের মনোমোহিনী হইয়াছ বা হইবে, সদা তাঁহার মনস্তুষ্টি করিতে প্রয়াসিনী হইবে। সদা তাঁহাকে প্রেম-নয়নে দেখিবে, হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে প্রেম করিবে। যখন শুনিব আমার ইচ্ছানুরূপ কাজ করিতেছ, তখন আর আমার আনন্দের সীমা থাকিবে না। তুমি আমার জন্য এক বিন্দুও উদ্বিগ্ন হইও না। আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি—আমাদের সম্মিলন হইবে না। জানি না, মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কি মঙ্গল উদ্দেশ্য ইহার মধ্যে নিহিত আছে। আমার স্পর্শে বুঝি তোমার কি অমঙ্গল ঘটিত! তুমি একবার মনে করিয়া দেখ, আমি হৃদয়কে কি অবস্থাপন্ন করিয়া তোমাকে এইরূপ অনুরোধ করিতেছি। তুমি আমাকে স্মরণ করিয়া কোন প্রকারে অসুখী হইও না। আমি বেশ থাকিব। কিন্তু তুমি যদি আমার এই অনুরোধ রক্ষা না করিয়া কাতর হও এবং অসুখে কাল যাপন কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি এক দিনের জন্যও সুখী হইতে পারিব না। আমি যখন শুনিব, তুমি একটি সুশীল পুরুষকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়াছ, যখন শুনিব সেই ভাগ্যবান্ তোমাকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন, তখন আমার আনন্দের সীমা থাকিবে না। আর কি বলিব, স্নেহ! অভাগার শেষ অনুরোধ রক্ষা করিয়া কায়মনোবাক্যে পতিসেবায় রত হও। কালের বিচিত্র গতি! সেই এক দিন তুমি আমাকে এই রূপ উপদেশ দিয়াছিলে, তাহা আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম। ঘটনাক্রমে আজ তোমাকে

সেইরূপ উপদেশ শুনিতে হইতেছে! স্নেহ! তুমি মনে করিও না, আমি অল্প কষ্টে তোমাকে এইরূপ উপদেশ দিলাম। আমি কি সহজে মনকে দৃঢ় করিয়াছি?—আর বেশি কি লিখিব? তুমি বুদ্ধিমতী। সব বুঝিয়া, মন স্থির করিয়া, সংসার-ধর্ম্মে ব্রতী হও ও আমাকে সুখী কর,—এই আমার শেষ প্রার্থনা। নারায়ণ তোমাকে সুখী করুন। বিদায় ইতি। তোমারই অমৃত—"

অমৃতলাল চিঠিখানি মুড়িয়া শিরোনামা লিখিলেন। তৎপরে দ্বারবান্‌কে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ বরাহনগরে হীরালালের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ভৃত্য আসিয়া জানাইল, আহার প্রস্তুত। অমৃতলাল মাথা নাড়িয়া আহারে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন।

ভৃত্য বলিল, "খাইবেন না কেন? কোন অসুখ হইয়াছে কি?"

অমৃতলাল বলিলেন, "না।"

ভৃত্য বলিল, "তবে কিছু খান।"

ভৃত্য অমৃতলালকে বড়ই ভালবাসিত। তাঁহার অন্ধকার ভাব দেখিয়া তাহার বড় ক্লেশ হইতেছিল।

অমৃতলাল ধীরে ধীরে একবার তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলেন; পরে কহিলেন, "দুগ্ধ আনিয়া দাও।"

ভৃত্য সত্বর দুগ্ধ গরম করিয়া আনিয়া দিল, কিন্তু আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইল না। সে চলিয়া গেলে অমৃতলাল অনেকক্ষণ সেইখানে বসিয়া রহিলেন। কক্ষস্থ ঘড়িতে এক দুই করিয়া বারটা বাজিয়া গেল। অমৃতলাল একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক শয্যায় শয়ন করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—*—

অধীরা শ্যামা।

যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী আজ তিন-চারি দিবস অবধি বড় ধুমধাম। চতুর্দ্দিক হইতে আত্মীয়-কুটুম্ব আসিতেছেন। স্ত্রীলোকদের আমোদ-আহ্লাদে ও ঝগড়া-বিবাদে বাড়ী কম্পিত হইতেছে। এক স্থানে কতকগুলি স্ত্রীলোক মণ্ডলাকারে বসিয়া অত্যুচ্চস্বরে মঙ্গলসূচক গান গাহিতেছেন। এ দেশের কোনপ্রকার মঙ্গলকার্য্যে দশ-পনর দিন পূর্ব্ব হইতে স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্যভাবে এইরূপ গান গাইয়া থাকেন। এক স্থানে কতকগুলি স্ত্রীলোক রন্ধনের নানা প্রকার আয়োজন করিতেছেন। এক স্থানে একটি যুবতী কতকগুলি শিশুকে আহার করাইতেছেন। কোন কোন শিশুর উদর পূর্ণ হইয়াছে, পরে যাহা মুখে দিতেছে তাহাই বমন করিবার উপক্রম করিতেছে—কেবল যুবতীর করপদ্মের প্রহারের ভয়ে অতি কষ্টে উহা উদরস্থ করিতেছে! কয়েকটী রন্ধনকারিণী রমণী শ্রদ্ধাসহকারে নানাবিধ সামগ্রী রন্ধন করিতেছেন। গোয়ালাগণ ভারে ভারে দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর প্রভৃতি বহন করিতেছে। চারিদিকেই 'আন,' 'নাও,' 'দাও' 'খাও,' ইত্যাদি শব্দ এক প্রকার প্রীতিপূর্ণ সামাজিক ভাব প্রকাশ করিতেছে।

ইতিমধ্যে একখানি পাল্কি আসিয়া বহির্ব্বাটিতে থামিল। বাড়ীর ভিতরে সংবাদ আসিল, নিরুপমের দ্বিতীয়া স্ত্রী আসিয়াছেন। ইহা শুনিয়া একটী বৃদ্ধা দ্রুত বৌ তুলিতে গেলেন। সঙ্গে বালক-বালিকার দল ছুটিল। বৃদ্ধা নববধূকে পাল্কি হইতে উঠাইয়া বাড়ীর মধ্যে আনিলেন। নববধূর আগমনে কতকগুলি রমণী একত্র হইয়া, চারিদিক কাঁপাইয়া, হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন।

গিরিবালা ও স্নেহ একটি ঘরে বসিয়াছিলেন। গিরি জানিত, তাহার সপত্নীকে আনিতে যাওয়া হইয়াছে। হুলুধ্বনি শুনিয়া তাহার আগমন বুঝিয়া তাহাকে দেখিতে দৌড়িল। স্নেহ তাহার এই সরল ভাব দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার সঙ্গে চলিল। গিরি সতীন দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। সতীন দেখিতে অতি কুৎসিত। নিরুপম অপেক্ষা লম্বায় অনেক বড়, একগলা ঘোমটা দিয়া একটা তালগাছের মত দাঁড়াইয়া আছে।

স্নেহ গিরিকে বলিল, "হাসিস কেন, লা? সতীন দেখিয়া কি হাসিতে হয়? দেখ, বৌ, তোমার সতীন তোমায় দেখিয়া হাসিতেছে। তুমি নিরুদাদাকে বলিয়া দিও।"

নববধূ লম্বিত ঘোমটা হইতে সকোপ-নয়নে সতীন দেখিতে লাগিল। নূতন বধূর ভার স্নেহের উপর অর্পণ করিয়া, সকলে স্বীয় স্বীয় কার্য্যে রত হইল।

পরশ্ব স্নেহের বিবাহ। সকলেই মহা আনন্দে মহা উৎসাহে কাজ-কর্ম্ম করিতেছেন। আর সেই অভিমানিনী শ্যামা কি করিতেছেন? তিনি স্বীয় কক্ষে শয়ন করিয়া অবিরল অশ্রুধারায় উপাধান সিক্ত

করিতেছেন। তাঁহার সেই স্থূল ও জ্যোতিপূর্ণ দেহ মলিন ও কৃশ হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ দেখিলে শ্যামাকে চেনা যায় না। শ্যামা স্নান না করিলে স্নেহ স্নান করে না, শ্যামা না খাইলে স্নেহ খায় না, তাই শ্যামা অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্নানাহার করেন।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, শ্যামা এখনও হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করেন নাই। একটী রমণী আসিয়া শ্যামাকে স্নান করিবার জন্য ডাকিল। রমণী একবার দুইবার ক্রমান্বয়ে তিন-চারিবার ডাকিল, কিন্তু শ্যামার উত্তর নাই। রমণী মনে করিল, শ্যামা বুঝি নিদ্রিতা। গাত্রে হাত দিয়াই রমণী শিহরিয়া উঠিল, শ্যামা অচৈতন্যা! রমণী তৎক্ষণাৎ এই সংবাদ সকলকে জানাইল। সকলে অতি দ্রুত সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। স্নেহের নিকটও এই সংবাদ পৌঁছিল। স্নেহ উন্মাদিনীর ন্যায় দৌড়িয়া আসিয়া মাতার বক্ষঃস্থলে মুখ রাখিয়া, কাতরকণ্ঠে 'মা', 'মা', বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। স্নেহের তৎকালীন অবস্থা দেখিয়া সকলেরই নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। ইতিমধ্যে যদুনাথ আসিয়া শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

অনেকক্ষণ শুশ্রূষার পর শ্যামার চৈতন্যোদয় হইল। তিনি ক্রমে নয়ন উন্মীলন করিলেন। তাহা দেখিয়া স্নেহের আর আনন্দের সীমা রহিল না। শ্যামাকে চেতন দেখিয়া গৃহস্থিত সকলে স্ব-স্ব কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

স্নেহ অশ্রুমার্জ্জন পূর্ব্বক সোহাগপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "মা, এখন কি অসুখ করিতেছে?"

শ্যামা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবান্, আমি কেন চেতনা পাইলাম?"

স্নেহ সরোদনে কহিলেন, "কেন, মা, আমি কি অপরাধ করিয়াছি? আমাকে ছাড়িয়া যাইতে কি তোমার একটুকুও কষ্ট হইবে না?"

শ্যামা অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "মা, তুই যে আমার সর্ব্বস্ব ধন! হায়! যে দিন তোকে পৃথিবীর সমুদয় সুখে বঞ্চিত করিবে, সেই দিন কি আমি জীবিতা থাকিব? আমার কি কেহ নাই যে, এই বিপদ হইতে আমায় রক্ষা করে? কেন আমার চেতনা হইল?"

বুদ্ধিমতী স্নেহ মাতার সান্ত্বনার জন্য বস্ত্রে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে, ধীরে ধীরে, পিতার শ্রুতিগোচর না হয় এই ভাবে, কহিলেন, "মা! তুমি কি জান না, আমি কোন সুখেরই আশা করি না। তোমাদের সুখই আমার একমাত্র সুখ। তোমাদের এই রূপ কষ্ট দেখিলে আমি এক দিনের জন্যও সুখী হইতে পারিব না।"

মাতা কন্যার এই অপরিসীম ধর্ম্মজ্ঞান, ও অপূর্ব্ব আত্মসুখ বিসর্জ্জন দেখিয়া আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। আপনাকে রত্নগর্ভা মনে করিয়া, কন্যাকে আপনার বক্ষে চাপিয়া, নয়ন-জলে স্নেহের সুন্দর কেশজাল সিক্ত করিতে লাগিলেন। এইরূপে অবিরল রোদন করিতে করিতে শ্যামা পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন! স্নেহ 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

যদুনাথ এতক্ষণ পর্য্যঙ্কের এক পার্শ্বে বসিয়া, গণ্ডদেশে হস্ত সংলগ্ন করিয়া, কি চিন্তা করিতেছিলেন। শ্যামার চৈতন্য বিলুপ্ত দেখিয়া পুনরায় ব্যস্ততাসহকারে তাঁহার শুশ্রূষায় রত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্যামার চৈতন্যোদয় হইল। কিন্তু এবার আর শ্যামার কথা কহিবার শক্তি

নাই। একে অতিশয় কৃশ দুর্ব্বল শরীর, তাহাতে ক্রমান্বয়ে দুইবার মূর্চ্ছায় শ্যামা অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। স্নেহ শীঘ্রগতি দুগ্ধ আনিয়া, অতি যত্নে, ধীরে ধীরে মাতার মুখে দিতে লাগিলেন। মাতাকে কিঞ্চিৎ সুস্থ ও সবল দেখিয়া স্নেহের মনে সাহস হইল।

স্নেহ মনের কথা প্রকাশ করিতে ভালবাসিতেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, মনোভাব প্রকাশ করিলে কোন ফল হইবে না। বালিকা সহিষ্ণুতায় বুক বাঁধিয়াছিলেন। কিন্তু আজ মাতার ক্লেশ দেখিয়া স্নেহ স্থির থাকিতে পারিলেন না। স্নেহ, পিতার চরণদ্বয় ধারণ করিয়া কম্পিত কণ্ঠে, সরোদনে বলিতে লাগিলেন, "বাবা, আমি তোমার অতি স্নেহের কন্যা, আমার একটি মাত্র প্রার্থনা পূর্ণ কর। আমি আর মার কষ্ট দেখিতে পারি না! আমি চিরজীবন তোমাদের চরণ-সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব, আমার বিবাহ দিও না। আমার এই বিবাহ হইলে আমি মাকে কখন বাঁচাইতে পারিব না।"

স্নেহের কথা শেষ হইতে না হইতে নির্ম্মম পিতা সক্রোধে পদদ্বয় ছাড়াইয়া, গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। আহা! সেই ননীর পুত্তলী পিতার চরণাঘাতে পড়িয়া গেলেন। তিনি পড়িয়া গিয়াছেন—মাতা পাছে দেখিতে পান—এই আশঙ্কায় দ্রুত মাতার পার্শ্বে বসিলেন। শ্যামা পশ্চাৎ ফিরিয়াছিলেন, এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিতে পান নাই। স্নেহকে নিকটে দেখিয়া কহিলেন, "নির্দ্দয় গিয়াছে? ওঃ কি নিষ্ঠুর!"

স্নেহ। মা, বাবাকে অমন কথা কেন বল? তাঁহার কিছু মাত্র দোষ নাই।

শ্যামা। অমন কথা বলিব না? তার দোষ নাই? সে কি তোর পিতা? সে তোর ভয়ানক শত্রু—সেই তোর সর্ব্বনাশের মূল।

তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময়ে নিরুপমের মাতা শ্যামার আহার্য্য আনিয়া স্নানাহারের জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। শ্যামা না খাইলে স্নেহ খাইবে না বলিয়া, শ্যামা কিঞ্চিৎ মুখে দিলেন। স্নেহ মাতার ভোজনাবশিষ্ট আহার করিয়া মাতার পার্শ্বেই বসিয়া রহিলেন। আজ আর মাতার চক্ষের অন্তর হইতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

——*——

মধুর মিলন।

ফাল্গুন মাসের দিবা অবসানপ্রায়। অপরাহ্ণ হইয়াছে, তথাপি পৃথিবীর উত্তাপ বিদুরিত হয় নাই। সমুদায় প্রাণীই কেমন এক আকুল ভাবে সময় যাপন করিতেছে। নানা প্রকার পাখীগুলি গাছের ডালে, পাতার আড়ালে, নানা প্রকার আকুল স্বরে ডাকিতেছে। দুই একটি ভ্রমর গম্ভীর স্বরে ডাকিতে ডাকিতে যেন কাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। দূরে পাপিয়া ধীরে ধীরে ক্রমে সপ্তম সুর চড়াইতেছে। থাকিয়া থাকিয়া দুই দল কোকিল, দুই দিক কাঁপাইয়া, মধুর ঝঙ্কারে চারিদিক আকুল করিতেছে। নীলাকাশে শ্বেতপর্ব্বতাকার-মেঘস্তূপ, উচ্চ বৃক্ষের মস্তকোপরি থাকিয়া, জগতে উঁকি মারিতেছে। বৃক্ষগুলি কেমন যেন শুষ্কতা প্রকাশ করিতেছে ও পত্রগুলি মৃদু-বায়ুভরে ঈষৎ হেলিয়া দুলিয়া যেন কাহারও নিকট সরসতা ভিক্ষা করিতেছে। পুষ্পবৃক্ষের নানা রঙ্গের সৌরভময় পুষ্পগুলি, কোমল বস্তু যে কঠিনতা সহিতে পারে না ইহাই প্রকাশপূর্ব্বক, বৃক্ষতলে পতিত হইয়া, বৃক্ষের সৌন্দর্য্য ম্লান করিতেছে। সকলে, সন্ধ্যা দেবী কখন শীতলতা লইয়া জগতে আগমনপূর্ব্বক স্নিগ্ধতা বিতরণ করিবেন, উৎসুক চিত্তে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে। বিস্তৃতা চঞ্চলা পদ্মা এখন স্থির।

মধ্যে মধ্যে তাহার বিশাল বক্ষে মুহূর্ত্তের মধ্যে মেঘমালার ছায়া আসিয়া পড়িতেছে। আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে, পরপারের গাছ ও ধান্যক্ষেত্রের উপর দিয়া, অতি দ্রুত চলিয়া যাইতেছে।

ক্রমে ক্রমে দিনকর, আপন তেজ আকর্ষণপূর্ব্বক, পৃথিবীস্থ উচ্চ পদার্থের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া পশ্চিমাকাশে প্রস্থান করিলেন। সূর্যের গমনে সন্ধ্যাদেবী ধীরে ধীরে সন্তপ্ত পৃথিবীতে পদার্পণ করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে পক্ষিগণ বিদায়সূচক ঝঙ্কারপূর্ব্বক, বিস্তৃত আকাশে পক্ষ বিস্তার করিয়া, আপন আপন কুলায় গমন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সমুদয় জগত আঁধারে ছাইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সুবিস্তীর্ণ নীলাকাশে দুই একটি করিয়া নক্ষত্রমালা ফুটিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে পুষ্পের কুঁড়িগুলি আধফুট হইল। দেখিতে দেখিতে বৃক্ষের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শাখা ও পাতাগুলি নাচিয়া উঠিল। সান্ধ্য সমীরণ মৃদু ভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার ছায়ার সঙ্গে আর একখানি ক্ষুদ্র মলিন ছায়া ধীরে ধীরে পদ্মার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। স্নেহলতা, বৃক্ষলতাশোভিত অতি নির্জ্জন পদ্মার তীরে আসিয়া, দূর্ব্বাসনে ধীরে ধীরে উপবেশন করিলেন। হঠাৎ অসুখে সুখ আসিলে, নিরাশায় আশা আসিলে কঠিনতায় কোমলতা আসিলে, বিষাদে প্রফুল্লতা আসিলে যেমন এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়--সেইরূপ কঠিনতাময় সংসার হইতে দূরে আসিয়া স্নেহের মন শান্তি লাভ করিল। পিঞ্জরমুক্তা বিহঙ্গীর ন্যায় স্নেহ একবার আপনার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, একবার সম্মুখস্থ পদ্মার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, একবার অসংখ্যনক্ষত্রশোভিত অপূর্ব্ব-

সৌন্দর্য্যময় আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কি এক সুধাময় ভাবে তাঁহার পবিত্র প্রাণটি পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র হস্ত দুখানি জোড় করিয়া, গদ্গদ্ চিত্তে, অশ্রুধারাবাহী নেত্রে, ধীরে ধীরে মধুর স্বরে বিভু-মহিমা গানে বিভোর হইয়া পড়িলেন! কে জানে এইরূপ মধুর ভাবে কতক্ষণ তাঁহার কাটিয়া গেল।

হঠাৎ কি ভাবে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "অমৃত! অমৃত! অমৃত! প্রাণের অমৃত! এই মধুময় সময়ে তুমি কোথায়? আর কি তোমায় দেখিতে পাইব না? একবার দেখিয়া যাও, আমার ইহজন্মের সমুদয় সুখ পদ্মার অগাধ সলিলে নিক্ষেপ করিতেছি! তুমিও আইস, এক সঙ্গে ব্রত গ্রহণ করি। না—না, তুমি এই কঠিন ব্রত গ্রহণ করিও না। তোমার প্রেমময় প্রাণ এই কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারিবে না। তবে তুমি কি করিবে? আমার প্রাপ্য সেই স্বর্গীয় প্রেম কি অন্য ভাগ্যবতীকে দিবে? অমূল্য ধন! তবে আমি কি আশায়, কেমন করিয়া জগতে তিষ্ঠিব?"

বালিকা আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে দুই হস্তে চক্ষু মুছিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, নির্জ্জন-বনভূমি কাঁপাইয়া কহিলেন, "তুমি সুখী হইলেই আমি সুখী হইব। তুমি যাহাতে সুখী হও তাহাই করিও।"

বালিকার নয়ন দুইটি আবার অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। বালিকা ঊর্দ্ধনেত্রে গদ্গদ ভাবে কহিলেন, "জানি না, ঠাকুর! এই ক্ষুদ্র জীবনের এই সন্তাপপূর্ণ ঘটনার মধ্যে, গুপ্তভাবে, তোমার কি মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে? এই দুঃখময় ঘটনার মধ্যে কি আবার মঙ্গল

আসিতে পারে? কি জানি আমি? আমি এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র বালুকণা মাত্র। আমার বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান এই অসীমের নিকট কিছুই নয়। তবে আমার সাধ্য কি আমার অনন্ত জীবনের মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে পারি? কে বলিবে, এই আশু-দুঃখপূর্ণ ঘটনার মধ্যে আমার অনন্ত জীবনের মঙ্গলের বীজ নিহিত নাই? জগতে এমন কাহার সাধ্য এই বিষম সমস্যার মীমাংসা করিতে পারে? যে স্রষ্টার ইঙ্গিতে এই বিশ্বচরাচর অনবরত পরিচালিত হইতেছে, এক মাত্র তাঁহারই নিকট এই গূঢ় রহস্য প্রকাশিত। মানব যতই কেন বিদ্যা ও বুদ্ধি, জ্ঞান ও গরিমায় স্ফীত হউক না—তাহার কি সাধ্য স্রষ্টার একটি মাত্র রহস্য প্রকাশ করিতে পারে? তবে আমি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া মঙ্গলামঙ্গল কি বুঝিব? এই ঘটনায় আমার কি কোন মঙ্গল ভাব নিহিত আছে? থাকিতে পারে। আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে অত্যল্প কালের মধ্যে তো কত দুঃখ হইতে সুখ উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছি। তবে কেমন করিয়া বলিব, আমার আত্মা অনন্তকাল এইরূপ দুঃখই ভুগিবে? হয় তো ইহা দুঃখ নয়—আমার সুখের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত! যাঁহার ইচ্ছায় আমি সৃষ্ট হইয়াছি—যাঁহার নিয়মে, যাঁহার অপার করুণায় আমি রক্ষিত হইতেছি—সেই করুণাময়ী মা কি আমায় চিরদুঃখে রাখিতে পারেন? আর যদি বা তিনি তাহাই করেন, তবে আমার সাধ্য কি তাহার অন্যথা করিতে পারি? না—না তাহা হইতে পারে না।—আমি তো, মা! তোমার দয়া ভিন্ন জগতে আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। মাগো! আমি কিছুই জানি না, বুঝি না। তোমার যাহা ইচ্ছা

তাহাই পূর্ণ হউক। 'তোমারই আদেশে রহিব এ দেশে, সুখ-দুঃখ যাহা দিবে সহিব।' কেবল, মা! একটি প্রার্থনা—মাঝে মাঝে প্রসন্নমুখে অভয়বাণী শুনাইও।"

বালিকার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। বালিকা করজোড়ে, উর্দ্ধনেত্রে আকাশপটে ও কি দেখিতেছে? দেখিতেছে; কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীর চন্দ্রমা মধুময় হইয়া ধীরে ধীরে, বৃক্ষের মাথার উপর দিয়া, উঁকি মারিতেছে। বালিকা ব্যাকুলভাবে কহিল, "মা! ঐ চাঁদের মত প্রকাশিত হইয়া আমায় আশ্বাস দাও, মা।"

হরি! হরি! ও কি? মধু! মধু! মধু! "ভুবন ডুবিল সুধাসিন্ধু-নীরে। কি দিব তুলনা, জগতে মিলে না।" কোটী চন্দ্রের স্নিগ্ধতা জিনি ভুবনমোহিনী, মধুময়ী, জগজ্জননী, বালিকার সম্মুখে ও কি মধুর ছন্দে ও কি মধুর বাণী শুনাইতেছেন? মধুর মূরতি! মধুর আভা! মধুর ভাষা! মধুর শোভা!—মধু! মধু! মধু! করুণাময়ী মা ধীরে অতি ধীরে কহিলেন, "এই যে আমি তোর সঙ্গে, মা! ধৈর্য্য ধর আর কেঁদ না।

যে করে আমার আশ, করি তার সর্ব্বনাশ,
তবু যে না ছাড়ে আশ, হই তার দাসের দাস।

বালিকা বিভোর—আপনাহারা। ধীরে ধীরে বালিকা ক্ষুদ্র কোমল পুষ্প হইয়া মায়ের বিশ্বময় চরণে লুটাইয়া পড়িল। মা বিশ্বসংসার কাঁপাইয়া আশীষ করিলেন, "নিষ্কামী হও।"

এই গাম্ভীর্য্যময়ী বাণীতে বালিকার চৈতন্যোদয় হইল। বালিকা মায়ের প্রসন্ন মুখ নিরীক্ষণাশায় মস্তক তুলিল। কিন্তু—কৈ মা? বালিকা

"মা! মা! কোথায় মা?" বলিয়া, অধীরভাবে ধূলায় লুটাইয়া, বনভূমি কাঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কৈ আর কেহই তো তাহাকে সেই মধুর ভাষে সান্ত্বনা করিল না?

হঠাৎ মায়ের আশীর্ব্বাদ বালিকার স্মরণ হইল,"—"নিষ্কামী হও।"

বালিকা চমকিত হইয়া,উঠিয়া বসিল, অশ্রু মুছিল। বালিকা আপন মনে বলিতে লাগিল, "মা আমার সঙ্গে আছেন! মা বলিয়াছেন, "ধৈর্য্য ধর—নিষ্কামী হও।" একবার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিল। দেখিল—বিশ্ব পূর্ব্বের স্বভাবেই অবস্থিতি করিতেছে। পুনর্ব্বার আকাশপানে চাহিয়া দেখিল—নির্ম্মল চন্দ্রমা সমুদয় জগতে সুস্নিগ্ধ শুভ্র কিরণ বিতরণ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে এক খণ্ড কৃষ্ণ মেঘ চাঁদের উপর দিয়া দ্রুতবেগে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে চলিয়া গেল। আরও একখানি, ক্রমে আরও একখানি মেঘ ক্রমাগত ঘন-ঘন চাঁদের উপর দিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। বালিকার কোমল হৃদয় যেন চাঁদের ব্যথায় ব্যথিত হইতে লাগিল। বালিকা বলিতে লাগিল, "সরিয়া যাও, মেঘ, সরিয়া যাও, কেন পবিত্র নির্ম্মল চন্দ্রকে ঢাকিয়া কষ্ট দাও?" মেঘেরা বালিকার কথা শুনিল না। দেখিতে দেখিতে সমুদয় আকাশ ছাইয়া ফেলিল ও অনবরত চাঁদের উপর দিয়া দৌড়াদৌড়ি করিয়া জগতকে অন্ধকারময় করিল। ক্রমে বট, অশ্বথ, ঝাউ, কদম্ব, তাল, তেঁতুল প্রভৃতি বড় বড় বৃক্ষগুলি সাঁ-সাঁ, সোঁ-সোঁ শব্দ করিয়া উঠিল। প্রবল ঝড় বহিল, সেই সঙ্গে চঞ্চলা পদ্মা উত্তাল-তরঙ্গমালা তুলিয়া নাচিয়া উঠিল। ক্রমে ঝড় একটু মৃদু হইল। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

বালিকা স্নেহের আজ ভয় নাই, তিনি আত্মহারা হইয়া জগতের এই পরিবর্ত্তনশীল অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিতেছেন। সহসা কে উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া, স্নেহের গলা জড়াইয়া, সরোদনে বলিলেন, "মা, তুই আমায় মারিয়া ফেল!"

স্নেহ চমকিতা হইয়া কহিলেন, "মা! তুমি কেন এখানে? তোমার যে অসুখ করিয়াছে।"

শ্যামা সরোদনে কহিলেন, "তা কি আর, মা তোর মনে আছে? হায়! আমিই তোর যত দুঃখের মূল। আমি মরি না কেন?"

স্নেহ আপন মনে কহিলেন, "দুঃখ নাই, নিষ্কামী হও।"

শ্যামা কহিলেন, "গৃহে চল।"

স্নেহ উঠিয়া, মাতার হস্ত ধরিয়া, ভিজিতে ভিজিতে গৃহে চলিলেন। স্নেহ আজ নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণে মধুর মূর্ত্তি দেখিতেছেন। অনবরত সেই মধুময় বাণী শুনিতেছেন—"নিষ্কামী হও।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সপত্নীদ্বয়।

আজ স্নেহের বিবাহ। যদুনাথের বাড়ী আনন্দে পরিপূর্ণ। রমণীদের হাস্য-গীতের ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ। কেহ বরণডালা সাজাইতেছে, কেহ চন্দন ঘসিতেছে, কেহ কজ্জল প্রস্তুত করিতেছে, কেহ পুষ্পমালা গাঁথিতেছে। কোথাও বালিকাগণ পুরাতন অলঙ্কার পরিষ্কার করিতেছে, কোথায় যুবতীগণ কেশবিন্যাস প্রভৃতি নানাপ্রকার সজ্জায় ব্যতিব্যস্ত। কোথাও কে কি অলঙ্কার পরিবেন, তাহাই লইয়া তর্ক করিতেছেন। রন্ধনশালায় নানাপ্রকার আহার্য্য প্রস্তুত হইতেছে। সময় সময় কর্ত্তা ব্যক্তিরা আসিয়া, "যথাসময় যেন বিবাহের সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুত থাকে" বলিয়া, সতর্ক করিয়া যাইতেছেন।

গিরিবালা শাশুড়ির অনুমতিক্রমে সপত্নীকে লইয়া পুষ্করিণীতে পূজার বাসনগুলি মাজিতে গেল। মঙ্গলা (নূতন বধূ) ঘাটে উপস্থিত হইয়া, আপন লম্বিত অবগুণ্ঠন উন্মোচনপূর্ব্বক, সতীনের প্রতি খর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সে তীব্র দৃষ্টিতে গিরির ক্ষুদ্র হৃদয়খানি কিছু ভীত হইল। মঙ্গলা কিছুক্ষণ এইরূপে নিরীক্ষণ করিয়া গম্ভীরস্বরে কহিল, "স্বামী আমার ঘরে আসেন না কেন?"

গিরি। স্বামী সে কথা আমায় কিছু বলেন নাই। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও।

মঙ্গলা। স্বামী তোকে খুব ভালবাসেন?

গিরি। বাস্নেন।

মঙ্গলার লোমপূর্ণ উঁচু-নিচু কপালখানি লোমশূন্য ভ্রুর সহিত কুঞ্চিত হইল, সমুদয় বদন তাম্রবর্ণ ধারণ করিল, ক্ষুদ্র ট্যারা চক্ষুদুটি বিস্ফারিত হইয়া অনবরত ঘুরিতে লাগিল, মুখবিকৃতির সঙ্গে সঙ্গে লম্ববান্ তাম্বুলরঞ্জিত দন্তপাটি বাহির হইয়া পড়িল। মঙ্গলা ভীষণ স্বরে কহিল, "তবে তুইই স্বামীকে আমার ঘরে আসিতে নিষেধ করিয়াছিস্।"

গিরি। বরং তোমার ঘরে যাইবার জন্য কত অনুরোধ করিয়াছি।

মঙ্গলা। তিনি কি বলিয়াছেন?

গিরি। তিনি বলিয়াছেন, তাঁর ভাল লাগে না।

মঙ্গলা। হুঁ, নিশ্চয়ই তুই বারণ করিয়াছিস, তোর জন্যই আসেন না।

গিরি একটু রাগিয়া কহিল, "তোমার নিজের জন্যই, জান না? বাবা! তোমার যে চোক! দেখিলে দিনের বেলাই ভয় করে। স্বামী বলেন, তোমায় দেখিলেই তাঁর জগদম্বা-দিদিমা বলিয়া বোধ হয়।"

এই কথা শুনিবামাত্র মঙ্গলা হস্তস্থিত পুষ্পপাত্র সজোরে আপন ললাটে আঘাত করিল। দেখিতে দেখিতে উচ্চ কপাল স্তূপাকার হইয়া উঠিল। সে বিকট-চীৎকারধ্বনি করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। গিরি ব্যাপার দেখিয়া দ্রুতপদে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল।

ক্রন্দন শুনিয়া সকলে সেই স্থানে দৌড়িয়া আসিল। কারণ জিজ্ঞাসা করায় মঙ্গলা সরোদনে কহিল—"গিরি আমায় এই বাটী দ্বারা মারিয়া পলাইল।"

পুষ্করিণীর নিকটেই একটী ঘরে নিরুপম ও স্নেহ বসিয়া এই সমুদয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। গিরির নামে এইরূপ মিথ্যা দোষারোপ নিরুপমের সহ্য হইল না। তিনি শীঘ্র আসিয়া কহিলেন, "রাক্ষসি, তুই নিজে না আঘাত করিলি?"

একজন বৃদ্ধা কহিল, "নিরুপম, তোকে বুঝি গিরি পাঠাইয়া দিল?"

নিরুপম। সে কেন পাঠাইবে? আমি আর স্নেহ এই ঘরে বসিয়া সব দেখিয়াছি। ঐ রাক্ষসী তাহাকে আরও কত কটু বলিয়াছে।

মঙ্গলা এখন ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতেছে আর ঘোমটা হইতে স্বামীকে, শ্বশুর-শাশুড়ীকে, ও আপন পিতা-মাতাকে গালি বর্ষণ করিতেছে।

অপর একজন বৃদ্ধা কহিল, "নিরুপম, তোর বড় দোষ। তুই কেন ওর ঘরে যাস্ না?"

নিরুপম। ওকে দেখিলেই আমার অর্দ্ধেক প্রাণ উড়িয়া যায়। জগদম্বা-দিদিমা হইতেও দুই কাটি বাড়া। ঘোমটা হইতে চাহিতেছে, কি ভয়ানক চক্ষু দুটা দেখ না!

বৃদ্ধা। তবে বিয়ে করেছিলি কেন?

নিরুপম। আমি কি সাধ করিয়া বিবাহ করিয়াছি। বাবা ও

জ্যেঠা-মহাশয় জোর করিয়া দিয়াছেন। আমি যখন বিবাহ করি, তখন বাবাকে বলিয়াছিলাম, আমি ওকে পরস্ত্রীর ন্যায় জ্ঞান করিব। এখন আবার তোমরা উহাকে আনিয়া আমার মহা যন্ত্রণা বাড়াইলে! এইরূপ করিলে আমি আর এখানে থাকিব না।

বৃদ্ধা। তুই ওকে বিয়ে করেছিস্। এখন ও যাবে কোথায়?

নিরু। আমি ওকে বিয়ে করি নাই। বাবার উপরোধে কতকগুলি মন্ত্র পড়িয়াছি ও কতকগুলি টাকা আনিয়া বাবাকে দিয়াছি। ও যদি এখন আবার বিয়ে করে, তাহা হইলে আমি সেই টাকাগুলি ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত আছি।

নিরুপমের কথা শুনিয়া সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বৌ ক্রোধে অধীর হইয়া আপন ললাটে আঘাত করিতে লাগিল। নিরুপম ধীরে ধীরে, আপন মনে কি বলিতে বলিতে, তথা হইতে চলিয়া গেল।

বৌ কাঁদিতে কাঁদিতে শাশুড়ীর নিকট গিয়া কহিল; "এখনই আমায় পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দাও, নতুবা আমি আত্মঘাতিনী হইব।"

শাশুড়ি বৌকে রাখিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু বৌ কিছুতেই সম্মতা হইল না। অগত্যা বৌকে তাহার পিতৃগৃহে পাঠান হইল।

কাহার অপরাধে এই অভাগিনী সমুদায় সুখে, সমুদায় আশায় জলাঞ্জলি দিয়া চলিয়া গেল? কেহ কেহ বলিবেন, উহার আপন স্বভাবের দোষ। কেমন করিয়া বলিব, উহার আপনার দোষ? জন্মিয়া অবধি যে একটি ভাল কথা শুনে নাই, ভাল উপদেশ পায় নাই,

সে সচরাচর যেরূপ দেখে, সেইরূপ হইবে না তো আর কি হইবে? নিরুপমের কি ইহাতে কষ্ট নাই? আছে বৈ কি? সেই বা এত কষ্ট পায় কেন? অনেকেই বলিবেন, তাহারই তো দোষ। কিন্তু তাহারই বা দোষ কি? সে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়াছে। যদি সে পিতার বাক্য অবহেলা করিত, তাহা হইলে তোমরা কহিতে—এমন অবাধ্য ছেলে থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল। তবে দোষ কাহার? কেহ বলিবেন, পিতার। তাই বা কেমন করিয়া বলি? তাঁহারা সমাজের রীতি অনুসারেই কাজ করেন। সমাজ-বিরুদ্ধ কাজ করিলে সাধারণের নিকট অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। কোন কোন নব্য যুবক বলিবেন, এমন সমাজ হইতে দূর হওয়াই শ্রেয়স্কর। ইঁহাদিগকেও বলি, তোমরা সমাজের তিরস্কার সহ্য করিতে চাহ না, কারণ, সমাজকে ভয় কর না; কিন্তু যাঁহারা সমাজ হইতে তাড়িত হইতে ইচ্ছা করেন না, লোকগঞ্জনা সহ্য করিতে চাহেন না, তাঁহাদের উপায় কি? সুতরাং উহার পিতারই বা বিশেষ দোষ কি? তবে দোষ কাহার?—দোষ তোমাদের সমাজের। যতদিন না তোমাদের অভাগিনী স্ত্রীদিগকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করিবে, যতদিন না এই অনুগতা স্নেহের আধার রমণীদিগকে স্নেহচক্ষে দেখিবে, যতদিন না এই কুৎসিত কৌলিন্য-প্রথা সমূলে উৎপাটিত করিবে, যতদিন না স্ত্রীদিগকে সহধর্ম্মিণী জ্ঞান করিবে, ততদিন তোমাদের সুখ-শান্তির সম্ভাবনা নাই। তোমরা জ্ঞানবান্ হইয়াও বুঝিলে না কিসে তোমাদের প্রকৃত সুখ-শান্তি আবদ্ধ রহিয়াছে!

আহা! সংসারের ঘোর উৎপীড়নে সদা ব্যতিব্যস্ত হইয়া গৃহে

যে একটু শান্তি পাইবে, সে আশাও তোমাদের অতি অল্প! আপন দোষে তোমরা অতি দুর্ভাগ্য। তোমাদের সমাজের জঘন্য রীতিগুলি সমূলে দূর কর। তোমাদের সংসারের সুখের মূল—দুঃখিনী রমণী-দিগকে সুশিক্ষা দিয়া উপযুক্তা মাতা, ভগিনী ও কন্যা কর, দেখিবে, তোমাদের সংসারে সর্ব্বদা সুখ-শান্তি বিরাজ করিবে, সংসার ও ধর্ম্ম এক হইবে, সংসারে থাকিয়াই বাঞ্ছিত ধর্ম্ম-ধন লাভ করিয়া ধন্য হইবে, এই সংসারেই স্বর্গসুখ অনুভব করিবে। প্রাচীন শাস্ত্রবাক্য স্মরণ রাখিও—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলা ক্রিয়াঃ॥"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

এই কি শুভ বিবাহ?

নানা প্রকার ঘটনায় বেলা অবসান হইয়া আসিল। আজ প্রাতঃকাল হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে মেঘ গাঢ়তর হইতে লাগিল। ক্রমে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, কড়-কড় শব্দে মেঘ ডাকিতে লাগিল। আজ কি ভয়ঙ্কর দিন! প্রকৃতি দেবীও যেন স্নেহের পুত্তলী স্নেহলতার সুখ-সূর্য্য অস্তগত দেখিয়া অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। কড়-কড় শব্দে গম্ভীর রবে আবার মেঘ ডাকিয়া উঠিল। সাবধান যদুনাথ! সাবধানে স্বমস্তক রক্ষা কর। যে ঘোরতর নিষ্ঠুরতায় প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহার ভয়ানক দণ্ড হইতে আপনাকে রক্ষা কর।

বাড়ীর মধ্যে সংবাদ আসিল—বর আসিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি মঙ্গলধ্বনিতে চতুর্দ্দিক কম্পান্বিত করিয়া তুলিল। কেহ কেহ বর দেখিতে গেল। যাহারা শ্যামা ও স্নেহের দুঃখ কিঞ্চিৎ মাত্র বুঝে নাই তাহারাও বলিল, "ওঃ এই জন্যই শ্যামা এত দুঃখ করে। আমরা ভাবিয়াছিলাম, বিবাহ আনন্দের কার্য্য, তাহাতে আবার দুঃখ কি? তা বর যে এমন তা তো জানি নাই।"

যাহারা বর দেখেন নাই তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, বর দেখিতে কেমন?"

রমণী কহিল, "কেমন তাহা কি করিয়া বলিব? না দেখিলে বুঝিতে পারিবে না। ভবি ঠান্‌দিদি বলিতেন, হরিমতির যে বর হইবে তাহার পায় দুইটা গোদ। গোবিন্দ বৈষ্ণবের মত কাল, গোষ্ঠ বৈষ্ণবের মত ভুঁড়ি, টাকপড়া মাথায়, পাকা-পাকা দুই-চারি গাছ চুলে তরমুজের বোঁটার ন্যায় একটি সিকা; ফোক্‌লা দাঁতে হাসিবে আর তোর সঙ্গে কথা কহিবে! আমি সেই ছেলাবেলায় বরের কিইবা বুঝি, তবু কাঁদিয়া মাটিতে গড়াগড়ি যাইতাম। তা এ বরের কেবল গোদ নাই, নতুবা প্রায় সবই সেই প্রকার।"

দ্বিতীয়া রমণী। বরের কয়টা বিয়ে শুনিয়াছিস্?

প্রথমা রমণী। না, কয়টা?

দ্বিতীয়া। এই স্নেহকে লইয়া চব্বিশটা হইল।

প্রথমা। তা কুলীনের পক্ষে এ আর এত বেশি হইল কি? তবে স্নেহ যেমন মেয়ে, তাহার পক্ষে বর একটু ছোট ও একটু সুন্দর হইলেই ভাল হইত।

তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় নিরুপমের মাতা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পূর্ব্বোক্তা রমণীগণ স্বীয় স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। নিরুপমের মার বদনেও কেন আজ বিষাদরাশি লক্ষিত হইতেছে? কেন আজ গিন্নি এক পার্শ্বে বসিয়া, বদনে অঞ্চল ঢাকিয়া, অশ্রুবর্ষণ করিতেছে? নিরুপম কেন, বর আসা অবধি, আপন শয্যায় শুইয়া, ঘন-ঘন দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত ক্রন্দন করিতেছে? ইঁহারা যদুনাথ প্রভৃতিকে এই বিবাহ দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। যখন জানিলেন, তাঁহারা এই

বিবাহে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন আপত্তি করা বৃথা বুঝিয়া নীরব ছিলেন। মনে করিয়াছিলেন, জামাতাটি যদি অল্পবয়স্ক ও সুন্দর হয়, তাহা হইলে হয়তো স্নেহ ও শ্যামা কোন মতে শান্তি লাভ করিবেন। কিন্তু বরকে দেখিয়া, তাঁহাদের সে আশালতাও সমূলে উৎপাটিত হইল। তাই তাঁহাদের এত ক্ষোভ ও দুঃখ।

স্নেহ কোথায়? সকলকে দেখা যাইতেছে, আর সেই মলিনা ছায়াখানিকে দেখা যাইতেছে না কেন? সেই মমতাময়ী স্নেহের পুত্তলী আজ সারাদিন মর্ম্মপীড়িতা মাতার নিকট বসিয়া আছেন এবং বার-বার মাতাকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে উপদেশ দিতেছেন। মাতা আজ প্রায় হতচৈতন্যার ন্যায় শয্যায় পড়িয়া আছেন। আহা! সেই তেজস্বিনী শ্যামাকে এখন হঠাৎ দেখিলে ভয় হয়। ঘোর মনস্তাপের দুর্দ্দান্ত প্রভাবে শ্যামা চলৎশক্তিরহিতা হইয়া পড়িয়াছেন। শ্যামার সেই উন্নত বপু শয্যায় মিশিয়া যাইতেছে। স্নেহ পার্শ্বে বসিয়া, নবজাত শিশুর ন্যায়, সযত্নে মাতার শুশ্রূষা করিতেছেন।

নিরুপম ধীরে ধীরে সেই শয্যার এক পার্শ্বে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "স্নেহ! আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করিবে?"

স্নেহ। বল, সাধ্য থাকিলে করিব।

নিরু। পলাইবে?

স্নেহ। কেন, আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি?

নিরু। অত্যাচারীর হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবে? সময় নাই—শীঘ্র বল—উপায় স্থির করি।

শ্যামার কর্ণে এই কথা প্রবেশ করিবামাত্র তিনি আনন্দে বলিয়া

উঠিলেন, "বাবা নিরু! তুই আমার কে? আহা চিরজীবি হও। শীঘ্র যাহা হয় একটা উপায় কর, বাবা।"

স্নেহ গম্ভীরস্বরে কহিল, "নিরুদা! তোমার মনে আবার এ ভাব আসিল কেন? এত দিনেও কি তুমি আমায় বুঝিলে না?"

নিরু। স্নেহ! আমি জানি, এ প্রস্তাব তোমার প্রীতিপ্রদ হইবে না। কিন্তু তুমি একবার চিন্তা করিয়া দেখ, কি ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত! না—না, তাহা কখনই হইবে না। আমার কথা তোমাকে অবশ্যই রাখিতে হইবে। তুমি প্রস্তুত হও, আমি সদুপায় স্থির করিয়াছি।

স্নেহ। আমার চির জীবনের সুখ তো আমি অনেক দিন পূর্ব্বেই পদ্মার অগাধ সলিলে বিসর্জ্জন দিয়াছি। নিরুদা! যে দয়াময় ঠাকুরের করুণায় আমি পিতা-মাতা পাইয়াছি, পৃথিবীতে আসিয়া অবধি যাঁহাদের অসীম স্নেহে প্রতিপালিতা হইয়াছি, তাঁহাদের ছাড়িয়া, এ পৃথিবীতে আমি কোথায় যাইব? তুমি কেন আমায় এরূপ অসঙ্গত অনুরোধ করিতেছ? আর আমায় ও কথা বলিও না, ভাই। আহা! মার আমার এমন অবস্থা দেখিয়া কেমন করিয়া তুমি এমন কথা মনে আনিলে?

নিরু। আমি পূর্ব্বে ভাবি নাই যে তুমি এতদূর করিবে! আমি কেমন করিয়া সেই অশীতিপর অথর্ব্ব বৃদ্ধকে তোমার করকমল গ্রহণ করিতে দেখিব? স্নেহ! কিছু দিনের জন্য পিতা-মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হও। এখানে আমার এক ঘর দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় আছেন। তাঁহারা অতি ভদ্র লোক। আমি তাঁহাদের বাটীতে তোমায় রাখিয়া

আসি, চল। তাহার পর তোমার মাতুলালয়ে পত্র লিখি। তাঁহারা আসিয়া তোমায় লইয়া যাইবেন। জেঠাইমার জন্য তুমি একটুকুও ভাবিও না। তোমার একটা উপায় হইলে নিশ্চয়ই তিনি সুস্থ হইবেন। আমি প্রাণপণে তাঁহার শুশ্রূষা করিব।

শ্যামা এতক্ষণ তাঁহাদের কথা শুনিতেছিলেন। তিনি ব্যাকুল ভাবে আগ্রহের সহিত কহিলেন, "মা স্নেহ! নিরু যা বলে শোন, শীঘ্র নিরুর সঙ্গে গিয়া সেই স্থানে আশ্রয় লও। মা! আর আমায় কষ্ট দিও না। আমি বেশ থাকিব, আমার জন্য কোন ভাবনা করিও না।"

এমন সময় নিরুপমের পিতা আসিয়া বলিলেন, "মা স্নেহ, সময় উপস্থিত।"

এই কথা কর্ণে প্রবেশমাত্র স্নেহের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। সেই শীর্ণ শরীর একবার, মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত, কম্পিত হইল। স্নেহ তখনি সে ভাব গোপনপূর্ব্বক নিরুপমের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "নিরুদা! মাকে দেখিও, মার নিকট হইতে কোথাও যাইও না।"

এই বলিয়া সেই অসীমধৈর্য্যশালিনী বালিকা, ভগবানের চরণ স্মরণ-পূর্ব্বক, পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, ধীরে ধীরে পিতৃব্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। শ্যামার চৈতন্য বিলুপ্ত হইল। নিরুপম যত্নে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন ও নানা প্রকারে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

স্নেহকে একটী ঘরে লইয়া গিয়া, স্নেহের খুল্লতাত অন্যান্য স্ত্রীলোক-দিগকে কহিলেন, "তোমরা স্নেহকে বিবাহের বস্ত্রাদি পরাইয়া রাখ। আমি একটু পরে আসিয়া লইয়া যাইব।"

সাহস করিয়া এতক্ষণ কেহ সাজাইতে যাইতে ছিল না। এক্ষণে একটী রমণী অগ্রগামিনী হইয়া বস্ত্রালঙ্কার চন্দন প্রভৃতি লইয়া সাজাইতে বসিল।

একটি যুবতী কহিল, "আহা! স্নেহের কি আর সে রূপ আছে? কেবল ঐ পাত্‌লা পাত্‌লা ঠোঁট দুখানিতে আর বড় বড় চক্ষুদুটিতে তাহাকে চেনা যায়।"

স্নেহ ক্ষীণ স্বরে কহিল, "এ বস্ত্র না ছাড়িলে কি হইবে না?"

একজন বৃদ্ধা কহিল, "ছিঃ, ও কাপড় পরিয়া কি বিয়ে হয়?"

স্নেহ দ্বিরুক্তি না করিয়া কাপড়খানি ছাড়িলেন। অলঙ্কার প্রভৃতি কিছুই গ্রহণ করিলেন না। তাঁহার অনিচ্ছা দেখিয়া আর কেহ বিশেষ অনুরোধ করিল না।

পুনর্ব্বার স্নেহের খুল্লতাত আসিয়া স্নেহকে বিবাহ-স্থানে লইয়া গেলেন। সম্প্রদানের সময় উপস্থিত হইল। বৃদ্ধের হস্তের সহিত স্নেহের সেই নবনীত-ক্ষুদ্র হস্তখানি মিলিত করিবার সময় যদুনাথের সেই কঠিন হৃদয়ও একবার কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, যেন তিনি কি ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করিতেছেন। পরক্ষণেই জামাতার কুল-মানের কথা মনে করিয়া হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিলেন। সম্প্রদান শেষ হইল। এই রূপে যথাবিহিত বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

বিবাহের পর বরযাত্রী ও নিমন্ত্রিতগণের যথাবিহিত আহারাদি কার্য্যও শেষ হইয়া গেল। বৃদ্ধ বর আহারান্তে, সারাদিনের উপবাসের পর ক্লান্ত শরীরে সত্বরই শয়নের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

একটি রমণী বৃদ্ধকে লইয়া গিয়া শয়ন-গৃহে শয্যা দেখাইয়া দিল। বৃদ্ধ শয়ন করিবামাত্র ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ স্নেহকে বাসর ঘরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। স্নেহ কহিলেন, "তোমাদের অনেক অনুরোধ রক্ষা করিয়াছি; আর কেন আমাকে কষ্ট দাও?" এই বলিয়া, দ্রুত মাতার গৃহে গিয়া, মাতার গলদেশ ধারণপূর্ব্বক শয়ন করিলেন। মাতা প্রাণের ধনকে বক্ষে চাপিয়া নিশা অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

স্নেহ! ধন্য তোমার পিতৃমাতৃভক্তি, ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা, ধন্য তোমার ভগবদ্ভক্তি!

বিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

নির্ম্মম পিতা।

পরদিন যথারীতি কুশণ্ডিকাও হইয়া গেল। স্নেহলতা নীরবে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিলেন। আজ বিবাহের তৃতীয় দিবস। আজ স্নেহের ফুল-শয্যা। সকলেই নানাপ্রকার আয়োজনে প্রবৃত্ত। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আজ স্নেহ বড়ই অন্যমনস্ক। কি জানি কি ভাবিয়া স্নেহের সেই ক্ষুদ্র-দেহলতা থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিতেছে। শ্যামার পীড়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি সময় সময় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেছেন। স্নেহ দিবা-রাত্রের মধ্যে এক মুহূর্ত্তও মাতার নিকট হইতে দূরে যান না। আহা! স্নেহকে দেখিলে আর চেনা যায় না। তাঁহার সেই কাঞ্চনবর্ণ শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে. সেই নবনীত-দেহ কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, সেই আকর্ণ-নয়নের কোলে কালিমা পড়িয়াছে, তবু বালিকা আপনার ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া অনুভব করিতেছেন না। মাতার দুঃখে তাঁহার কোমল প্রাণ বড়ই ব্যথা বোধ করিতেছে। সর্ব্বদা মাতার পার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন। মাঝে মাঝে মাতার কথা ভাবিয়া মাতার অজ্ঞাতে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। সদাই তাঁহার মমতাময় হৃদয়ে আশঙ্কা হইতেছে, "মা বুঝি আর বাঁচিবেন না।"

যদুনাথ ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ধীরে ধীরে ডাকিলেন, “স্নেহ!”

স্নেহ উত্তর করিলেন, “বাবা!”

যদুনাথ কহিলেন, “আজ তোমার ফুল-শয্যা। তোমার জন্য মেয়েরা অপেক্ষা করিতেছেন। তুমি যাও, আজ আমি এখানে থাকিব।”

স্নেহ দুই হস্তে আলুলায়িত-কেশরাশি অপসারিত করিয়া যদুনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহা দেখিয়া যদুনাথের নির্ভয় হৃদয়েও কি এক প্রকার ভয়ের সঞ্চার হইল।

স্নেহ সরোদনে কহিলেন, “বাবা, এখনও কি তোমার ইচ্ছার শেষ হয় নাই? আমাকে ক্ষমা কর।”

যদুনাথ। যাও, স্নেহ, আমি বলিতেছি। আমার আজ্ঞা পালন কর।

স্নেহ। বাবা, আমি তো যথাসাধ্য তোমার আদেশ পালন করিয়াছি, এখন যাহা বলিতেছ ইহাতে আমি নিতান্ত অক্ষম—আমায় ক্ষমা কর।

যদুনাথ। তোমায় যাইতে হইবে—শীঘ্র যাও।

স্নেহ। বাবা! তুমি কেমন করিয়া আমায় মাকে ছাড়িয়া যাইতে বলিতেছ? তোমার চরণে আমি কি অপরাধ করিয়াছি? আমায় ক্ষমা কর, আমি নিতান্তই তোমার এই আজ্ঞা পালনে অসমর্থা।

যদুনাথ। আচ্ছা, আমার আজ্ঞা পালনে সমর্থা হও কিনা দেখা যাইবে।

এই বলিয়া সক্রোধে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই এই ঘটনা সকলে অবগত হইল। অবশেষে বৃদ্ধ বরের কর্ণেও ইহা প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ শ্রবণমাত্র ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবরে তৎক্ষণাৎ স্বজন-সমভিব্যাহারে স্বগ্রামে প্রস্থান করিলেন।

"ছেলে মানুষ, বুঝে না, কত দিন আর এইরূপ করিয়া পারিবে"—ইত্যাদি অনেক সুমিষ্ট বচনে সকলে বৃদ্ধকে ক্রোধ সম্বরণের জন্য অনুরোধ ও তোষামোদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বরের কিছুতেই ক্রোধের শান্তি হইল না। সমাজে গোল বাঁধাইবে, এই অপমানের প্রতিশোধ দিবে, ইত্যাদি বলিয়া যদুনাথ প্রভৃতিকে ভয় প্রদর্শন করিয়া গেলেন।

কুলাভিমানী বর মহাশয় যদুনাথ হইতেও কুলে শ্রেষ্ঠ এবং সমাজের একজন দলপতি। সমাজস্থ সকলেই বৃদ্ধকে অল্পাধিক ভয় করে। সুতরাং বৃদ্ধের এই আচরণে যদুনাথের ও তাঁহার ভ্রাতাদের মনে যে বিশেষ ভয়ের সঞ্চার হইল, তাহা আর বলিতে হইবে না। যদুনাথ এই সম্বন্ধে কি করিবেন ভ্রাতাদের সঙ্গে সে বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অনেক পরামর্শের পর এই স্থির হইল যে, পরদিন স্নেহকে কিছু অর্থ ও উপঢৌকনসহ সমাজস্থ একজন প্রধান লোকের সঙ্গে বৃদ্ধের গৃহে পাঠান হইবে। তাহা হইলেই, সেই অর্থের লোভে এবং প্রেরিত লোকের অনুরোধে, বৃদ্ধ স্নেহকে গ্রহণ করিবেন। এইরূপ গোলমালে রাত্রি প্রায় অবসান হইল। তখনই শিবিকা আনিতে লোক প্রেরিত হইল।

স্নেহ প্রত্যহ প্রাতঃকালেই স্নান করিতেন। মাতাকে নিদ্রিতা দেখিয়া আজও প্রভাতে স্নান করিবার জন্য পুষ্করিণীতে গেলেন। আহা!

অসহায়া বালিকা জানিত না, আজ তাহার কি ভয়ানক দিন উপস্থিত। দুঃখিনী ধীরগমনে যেমন পুষ্করিণীর সোপানের উপর উপস্থিত হইলেন, অমনি নির্দ্দয় পিতা ও খুল্লতাত প্রভৃতি আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া পাল্কিতে উঠাইলেন। আহা! মমতাময়ী স্নেহের প্রতিমা পিতার নির্দ্দয় ব্যবহার দেখিয়া এবং মাতার অবস্থা স্মরণ করিয়া, অজস্র ধারে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখনও সেই শান্তস্বভাবা ধর্ম্মপ্রাণা বালিকা নীরবে স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার অন্তর-তম স্থান হইতে ধ্বনিত হইতেছিল, "ধৈর্য্য ধর—নিষ্কামী হও।"

তাঁহার তৎকালীন ভাব দেখিয়া যদুনাথের নির্দ্দয় হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি কহিলেন, "কি করিব, মা! তুমি যে অবাধ্য।"

অনন্তর বাহকেরা শিবিকা উত্তোলন করিল। তখন বালিকা কাতরস্বরে কহিল, "বাবা! মাকে দেখিও, সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রবোধ দিও।"

"সে জন্য তুমি ভাবিও না, মা! আমাদের ইচ্ছানুরূপ কাজ করিও।" এই বলিয়া যদুনাথ প্রভৃতি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাহকেরা হুঁ হুঁ শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল। সঙ্গীয় লোক-জনেরাও পাল্কির সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। দুঃখিনী স্নেহের প্রতিমা স্নেহলতা দীনবন্ধু শ্রীহরির চরণকমল স্মরণপূর্ব্বক, নিস্পন্দভাবে নয়ন মুদ্রিত করিয়া, পাল্কির মধ্যে বসিয়া রহিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

তুমি কি আমার দাদা ?

প্রথম গ্রীষ্মের আবির্ভাবে সমস্ত জীব আকুল। অপরাহ্ণ কাল। তথাপি সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে গ্রীষ্মের লাঘব বোধ হইতেছে না। বাতাসের নাম মাত্র নাই, কেবল স্থানে স্থানে কৃষ্ণমেঘসকল, সূর্য্যের তীক্ষ্ণ কিরণ ঢাকিয়া, ধীরে ধীরে সুদূরবিস্তৃত-আকাশ-মার্গে গমন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে সেই ক্ষুদ্র-মেঘখণ্ডসমূহ এক দিক আশ্রয় করিল। সেই বহু-খণ্ড-মেঘমালা একত্র হইয়া চতুর্দ্দিক আঁধারে ডুবাইয়া ফেলিল। দিবসে রজনী সমাগত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সোঁ-সোঁ শব্দে বায়ু উত্থিত হইল। বোধ হইল, পৃথিবীস্থ সমুদয় বৃক্ষাদি হেলিয়া দুলিয়া, মস্তক নাড়িয়া, কাহারও যেন মহামহিমময় অসীম শক্তির ঘোষণায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। চপলা-সুন্দরী যেন কাহার গুপ্ত প্রেমে মত্ত হইয়া, গাঢ়-কৃষ্ণময় আকাশে আপন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তারপূর্ব্বক, ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পরক্ষণেই কড়-কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া কাহার মহিমা প্রকাশ করিয়া উঠিল। বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে পদ্মাসুন্দরী আপন উত্তাল-তরঙ্গমালা ফেনময় করিয়া অপার আনন্দে যেন নৃত্য করিয়া উঠিল। পদ্মার এখনকার এই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিলে

বোধ হয়, পৃথিবী বুঝি ইহার এই বিস্তৃত তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অতল জলে নিক্ষিপ্ত হয়। গুপ্তভাবে কি মহাশক্তি!

এই ভয়ানক সময়ে পদ্মার তরঙ্গ ভেদ করিয়া একখানি বোট তীরাভিমুখে আসিতেছে। এই ভীষণ তরঙ্গের মধ্যে এক এক বার যেন বোটখানি অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। ঝড়ের গতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি দেখিয়া দাঁড়ি-মাঝিরা যেন প্রাণপণে স্ব-স্ব কার্য্যে ব্যস্ত। এইরূপে অতি কষ্টে বোটখানি তীরবর্ত্তী হইল। বোটের মধ্য হইতে একজন যুবা বাহির হইয়া আসিলেন। মাঝিরা কহিল, "বাবু আপনি তীরে নামুন, আমাদের অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে। আমাদের প্রাণপণে বোট রক্ষা করিতে হইবে।"

যুবা উত্তর করিলেন, "তোমরা উঠিয়া বোটের কাছি ভাল করিয়া বাঁধ, বোট-মধ্যে থাকিও না।"

এই বলিয়া, বোট তীরে না লাগিতেই, যুবা বোট হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি হিন্দুস্থানী দরোয়ানও নামিল।

যুবা তীরে উঠিয়া বায়ুর তাড়নায় মুহূর্ত্তও দাঁড়াইতে পারিলেন না। গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে বায়ুর গতি অল্প হইয়া আসিল। ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। এক ফোঁটা দুই ফোঁটা করিয়া ক্রমে ক্রমে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা যুবার মস্তকোপরি পতিত হইতে লাগিল। রজনী সমাগত। ঘোর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন। পথ দৃষ্ট হইতেছে না। কেবল মধ্যে মধ্যে চপলার চপল প্রভায় যুবা পথ দেখিয়া লইতেছেন। অনেক ক্ষণ এইরূপ গমনের পর তাঁহার বোধ হইল, সম্মুখে কি একটা কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ রহিয়াছে।

তাঁহারা সেইখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইলেন। তৎপরে বিদ্যুতালোকে দেখিলেন, সেই পদার্থটা আর কিছুই নহে, একটী ক্ষুদ্র পর্ণ-কুটীর।

যুবা সঙ্গের লোককে কহিলেন, "তুমি দেখিয়া আইস, ঐ গৃহে কেহ আছে কিনা?"

ভৃত্য দেখিয়া সত্বর আসিয়া কহিল, "মহারাজ, ঘরে কেহ নাই।"

যুবা মনে করিলেন, যাহার গৃহ সে নাই, তবে কি করিয়া তাহার মধ্যে যাইব? কিন্তু বৃষ্টিধারা হইতেই বা কিরূপে রক্ষা পাইব?" যুবা কোন প্রকারেই আর অনাবৃত স্থানে বৃষ্টিধারা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন, "যাই, কিছুক্ষণ ঐ গৃহ-মধ্যে গিয়া আত্মরক্ষা করি। তৎপরে গৃহস্বামী আসিলে আমার অবস্থা সমুদায় তাহার নিকট খুলিয়া বলিব। তাহা হইলেই আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আর কোন মতেই এইরূপে চলিতে পারি না।" এই স্থির করিয়া যুবক দ্রুতগমনে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। অতিশয় অন্ধকারপ্রযুক্ত গৃহমধ্যস্থ কোন বস্তুই দৃষ্ট হইল না।

দরোয়ান কহিল, "বড় অন্ধকার। আপনি যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে একটি বাড়ীর সন্ধান লইয়া আসি। বোধ হয় এখানে আরও গৃহস্থের বাড়ী আছে।"

যুবা কহিলেন, "আচ্ছা যাও, শীঘ্র আসিও।"

দরোয়ান চলিয়া গেল। যুবা আর্দ্র বস্ত্রে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে কতকগুলি লোকের কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি দেখিলেন, সেই লোকেরা সেই গৃহাভিমুখে আসিতেছে। যুবা একটু আড়াল হইয়া দাঁড়াইলেন। ঐ লোকেরা

এক খানি পাল্কি হইয়া আসিতেছিল। তাহারা ঘরের ভিতরে পাল্কি নামাইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল।

প্রথম। দেখেছিস্, ভাই! কেমন অন্ধকার?

দ্বিতীয়। আমার তো, ভাই, এখানে দাঁড়াইতে ভয় করিতেছে।

তৃতীয়। আরে, ভাই, দেখ্! ঘরটার মধ্যে যেন কি নড়িতেছে।

চতুর্থ। হাঁ, আর কেউ শুনিল না, কেবল তুই শুনিলি। তোর এমন ভয় কেন?

তৃতীয়। আচ্ছা, কান পাতিয়া শোন্ দেখি, কে যেন নিশ্বাস ফেলিতেছে।

কিছুক্ষণ সকলে নীরব থাকিয়া কহিল, "হাঁ, অন্য কেহ যেন ঘরের মধ্যে আছে, বোধ হইতেছে।"

দ্বিতীয়। বাবারে! মরিলাম রে, গেলাম রে, খাইয়া ফেলিল রে, কেন আমি হতভাগাদের সঙ্গে আসিয়াছিলাম রে!

চতুর্থ। চুপ্, পাজি, চল্, আমরা একটা লাঠি লইয়া আসি, দেখি কোন্ খানে ভূতটা।

তৃতীয়। তোরা কেউ এখানে থাকিবি না—মেয়েটকে যদি ভূতে খাইয়া ফেলে?

প্রথম। হতভাগা, তুই এখানে থাক্। আমরা আলোর জোগাড় করিতে চলিলাম।

এই বলিয়া সকলে দীপ আনিতে চলিয়া গেল। যুবা ইহাদের ডাকাইত মনে করিয়া এতক্ষণ গৃহের এক কোনে দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু যখন "মেয়েটাকে ভূতে খাইয়া ফেলিবে" শুনিলেন, তখন তাঁহার

আত্মপ্রকাশ করিতে ইচ্ছা হইল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, দস্যু কর্ত্তৃক কোন রমণী আক্রান্তা হইয়াছে।

ইত্যবসরে ঐ শিবিকামধ্যস্থ রমণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, করুণ-স্বরে কহিলেন, "মা, এই অন্ধকার-মধ্যে আবার তোমার সেই মধুময় জ্যোতি প্রকাশ কর। আবার আমায় আশ্বাস-বাণী শুনাও। আমি যে তোমার অতি ক্ষুদ্র মেয়ে; এই দুর্ব্বল ক্ষুদ্র মেয়েকে আর কত পরীক্ষা করিবে, মা?"

এই করুণ-কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র যুবা অতি দ্রুত শিবিকার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং শীঘ্র দুই হস্তে শিবিকার দ্বার উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক ব্যাকুলকণ্ঠে কহিলেন, "স্নেহ! দিদি আমার! কোন্ পাষণ্ড তোমার এই অবস্থা করিল?"

স্নেহ সেই পরিচিত সুমিষ্ট স্বর শুনিবামাত্র অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। উত্তর না পাইয়া যুবা বুঝিলেন, স্নেহ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পাল্কির মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং আপনার আর্দ্র বস্ত্র হইতে জল লইয়া, স্নেহের শুষ্ক মুখে প্রদান করিলেন।

ইতিমধ্যে যুবার ভৃত্য বাতী লইয়া উপস্থিত হইল। দীপ পাল্কিমধ্যে লইয়া, যুবা শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন—স্নেহলতার সেই অতুলসৌন্দর্য্যরাশি বিলুপ্ত এবং সেই কুসুমসদৃশ সুকোমল হস্তদ্বয় বদ্ধ। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া,যুবার গণ্ড বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। তিনি অতি যত্নে স্নেহের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া কহিলেন, "স্নেহ! আমাকে দেখিয়া কি আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছ? আশ্চর্য্য কি? এই নির্দ্দয়-দস্যু-হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য

ভগবান্ আমাকে এই স্থানে আনিয়াছেন। ধন্য ভগবান্! কোন্ ঘটনাসূত্রে যে তুমি কি কর, কার সাধ্য বুঝিয়া উঠে !"

স্নেহ ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি ?"

স্নেহ আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। আয়ত-নয়ন-যুগল হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু সেই শুষ্ক কপোল বহিয়া পড়িল। বালিকা ক্ষুদ্র-হস্তদুখানি যুক্ত করিয়া কহিলেন, "দীনবন্ধু! তোমার এত করুণা এই অধম দাসীর উপর !—সত্য করিয়া বল, তুমি কি আমার দাদা ?"

"দিদি আমার! তুমি চাহিয়া দেখ, আমি তোমারই দাদা তোমার কাছে বসিয়া আছি"—এই বলিয়া, যুবা স্নেহের ভগিনীর মস্তক আপন কোলে তুলিয়া লইলেন।

পাঠক, কি চিনিতে পারিয়াছেন, এই যুবক আমাদের হীরালাল? এক সপ্তাহ পরে এই দুর্য্যোগে বিক্রমপুর পৌঁছিয়া, স্বপ্নেও যাহা কল্পনা করেন নাই, অদ্য সেই অভাবনীয় ব্যাপার দেখিলেন।

যে সমাজ-শিরোমণির হস্তে স্নেহকে অর্পণ করা হইয়াছিল, সেই নিঃস্বার্থ মহোদয় ঝড়-বৃষ্টি দেখিয়া এক গৃহস্থের বাড়ী আশ্রয় লইয়াছিলেন। এখন ঝড়-বৃষ্টি থামিয়াছে দেখিয়া, শিরোমণি মহাশয় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। পথে দীপ হস্তে চারি জন বাহককে দেখিয়া, স্নেহকে সেই ভূতাকীর্ণ স্থানে একাকী ফেলিয়া আসার নিমিত্ত নানাবিধ সুমধুর আত্মীয়তাসূচক সম্বোধন করিয়া, পুনরায় সত্বর অগ্রসর হইতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু উপদেবতার ভয়ে আপনি সকলের পিছে চলিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই সকলে সেই ক্ষুদ্র কুটীরে আসিয়া পৌঁছিল। শিরোমণি মহাশয়, হীরালালকে সেই

খানে তদবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া, অগ্নি-অবতাররূপে কটূক্তি করিতে লাগিলেন, ও স্নেহের প্রতি রোষপূর্ণ কটাক্ষপাতপূর্ব্বক, অভদ্রোচিত বাক্য প্রয়োগ করিয়া, নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

হীরালাল গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "চুপ কর, দ্বিতীয়বার ঐরূপ কদর্য্য কথা বলিও না, অপমানিত হইবে।"

শিরোমণি মহাশয় যমদূতের ন্যায় হিন্দুস্থানী দরোয়ানকে দেখিয়া ভীত হইলেন।

স্নেহ কহিলেন, "ইনি আমার দাদা। আপনি কিছু মনে করিবেন না।"

ইতিমধ্যে বোটের মাঝিরা এবং হীরালালের অন্যান্য চাকরেরা তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া হীরালাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "বোট নিরাপদে আছে তো?"

মাঝিরা কহিল, "আজ্ঞা হাঁ, বোট নিকটেই আনা হইয়াছে।"

হীরালাল কহিলেন, "এই পাল্কি লইয়া বোটে চল।"

শিরোমণি। আপনি কোথায় পাল্কি লইয়া যাইবেন? স্নেহ যে বলিতেছে, আপনি তাহার ভ্রাতা, তাহারই বা প্রমাণ কি? আপনি পাল্কি লইয়া যাইতে পারিবেন না। আপনাকে ভদ্রলোকের মত দেখাইতেছে; কেন ভদ্রলোকের মান নষ্ট করিবেন? স্নেহের পিতা আমাকে ইহার শ্বশুরালয়ে দিয়া আসিতে বলিয়াছেন।

এই শেষ কথা শুনিবামাত্র, শিরোমণি মহাশয়ের কথায় বাধা

হিয়া, হীরালাল বলিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! স্নেহ কি বিবাহিতা? স্নেহ, শীঘ্র বল, তুমি কি সত্যই বিবাহিতা?"

স্নেহ। হাঁ। বিবাহের বৃত্তান্ত পরে সব বলিব। দাদা! শীঘ্র যাহাতে মাকে দেখিতে পাই তাহার উপায় কর। মা আমার এতক্ষণ আমায় না দেখিয়া জীবিতা আছেন কিনা সন্দেহ।

হীরালাল। আমি তো ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তবে কি তাঁহাকে না জানাইয়াই তোমাকে লইয়া যাওয়া হইতেছে? তাহাই হইবে, নতুবা তোমার হাত বাঁধা থাকিবে কেন? কি নিষ্ঠুরতা!—চল, তোমরা শীঘ্র পাল্কি লইয়া চল।

তাঁহারা পাল্কি লইয়া যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, একটি বৃদ্ধা লাঠিতে ভর করিয়া আসিতেছে। হীরালাল বুঝিলেন, উহা বৃদ্ধারই ঘর।

হীরালাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ঘর কি তোমার?"

বুড়ী কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "দুই-তিনটা হাঁড়ী আছে, একখানা ভাঙ্গা পাথর, একটা ভাঙ্গা ঘটি আছে, তাহা তোমরা লইয়া যাইতেছ?"

হীরালাল কহিলেন, "না গো, না—আমরা তোমার ঘরের কিছুই লইয়া যাইতেছি না। ঝড়-বৃষ্টির জন্য তোমার ঘরে একটু বসিয়াছিলাম।" অনন্তর ভৃত্যকে কহিলেন, "বৃদ্ধাকে চারিটী টাকা দাও।" বৃদ্ধা সেই টাকা চারিটী পাইয়া আনন্দে অবাক হইয়া গেল।

তাঁহারা চলিয়া গেলেন। একজন ভৃত্য কহিল, "তোমাদের পাল্কি লইয়া যাও।"

বেহারারা পাল্কি লইয়া চলিল। শিরোমণি মহাশয়ও হতবুদ্ধি হইয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহারা বোটে উঠিলেন।

হীরালাল কহিলেন, "শিরোমণি মহাশয়, কেন কষ্ট পাইবেন? বোটে আসুন না, নিরাপদে বাটী পেঁছিবেন।"

শিরোমণি মহাশয়ের তখন বিশ্বাস হইয়াছিল, ইনি অন্য লোক নহেন, স্নেহের ভ্রাতাই হইবেন। তিনি কহিলেন, "আচ্ছা আপনার সঙ্গেই যাই। পথে বড় কষ্ট পাইয়াছি।" এই বলিয়া বোটে উঠিলেন।

বেহারাগণ কহিল, "আমাদের ভাড়া দিউন।"

শিরোমণি মহাশয় কহিলেন, "বাড়ী গিয়া পাইবি। আর তোরা যদি আগে যাস্, তবে এই সমুদয় ঘটনা বাঁড়ুয্যে মহাশয়কে বলিস্।"

হীরালাল কহিলেন, "হাঁ, বলিস্, ভাল বীরপুরুষকে সঙ্গে দিয়া কন্যা পাঠাইয়াছিলেন। তিনি খুব বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার জন্য শীঘ্র ব্রাহ্মণ ভোজনের আযোজন করুন। আর দক্ষিণাটাও ঠিক রাখিবেন।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

উদ্ধার।

অনন্তর তাঁহারা সকলে বোটের মধ্যে আসিয়া আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। মাঝিরা বোট খুলিয়া দিল। স্নেহ সারাদিনের উপবাসে ও ক্লেশে আর কথা করিতে পারিলেন না, শুইয়া পড়িলেন। হীরালাল সত্বর দুগ্ধ উষ্ণ করাইয়া স্নেহকে পান করাইলেন। তৎপরে পাচককে আহারের আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন।

হীরালাল স্নেহের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সেই আর্দ্রকেশরাশি মুছাইতে লাগিলেন ও নানাবিধ গল্প করিতে লাগিলেন। অল্প-ক্ষণের মধ্যেই আহার্য্য প্রস্তুত হইয়া আসিল। হীরালাল স্নেহকে সস্নেহে আহারে বসাইয়া আপনিও তাহার পার্শ্বে আহারে বসিলেন। শিরোমণি মহাশয় একপার্শ্বে বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন। হীরালাল তাঁহার প্রতি চাহিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "শিরোমণি মহাশয়! আহার করিবেন না?"

শিরোমণি মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা দিন। নদীর উপর দোষ নাই। সারাদিনের অনাহারে প্রাণ যায়। শাস্ত্রে আছে, "তৃণে কাষ্ঠে রণে যজ্ঞে।"

তাঁহার এই কথা শুনিয়া হীরালাল হাসিয়া উঠিলেন। স্নেহের সেই শুষ্কবদনখানিতেও ঈষৎ হাস্যের ছটা প্রকাশ পাইল। শিরোমণি মহাশয়কে আহারে বসান হইল। শিরোমণি মহাশয় বড়-বড় গ্রাসে অনন্যমনে• আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। আহারান্তে সকলে উপবেশন করিলেন। একজন ভৃত্য তাম্বুল আনিয়া দিল।

হীরালাল ভৃত্যকে কহিলেন, "শিরোমণি মহাশয়কে তামাকু আনিয়া দাও।"

শিরোমণি মহাশয় নীরবে বসিয়া তামাকু টানিতে লাগিলেন। হীরালাল, শিরোমণি মহাশয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, সহাস্যে কহিলেন, "শিরোমণি মহাশয়, আপনাদের দেশে যাইতেছি, সকলকে বলিয়া দিব—শিরোমণি মহাশয় মুসলমানের নৌকায় আহার করিয়াছেন।"

শিরোমণি মহাশয় চমকিত হইয়া, শশব্যস্তে হুঁকা রাখিয়া, রোরুদ্যকণ্ঠে কহিলেন, "বাবু! দোহাই আপনার! আমায় নষ্ট করিবেন না।"

হীরালাল। কেন আপনি তো বলিয়াছেন, নৌকায় কোন দোষ নাই। আমি নিশ্চয়ই আপনার এই ব্যবস্থার কথা সকলের নিকট বলিব।

শিরোমণি মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া, আপনার উপবীত আঙ্গুলে জড়াইয়া, জোড়হস্তে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "দোহাই বাবু, আপনি ব্রাহ্মণের সন্তান, আমার জাতি নষ্ট করিবেন না।" এই বলিয়া হীরালালের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িলেন।

হীরালাল, "করেন কি?" "করেন কি?" বলিয়া, শিরোমণি মহাশয়ের হাত ধরিয়া উঠাইলেন ও আপন পার্শ্বে বসাইয়া কহিলেন, "আপনি বৃদ্ধ মানুষ, কেন এত ব্যস্ত হইলেন?"

শিরোমণি। আপনি বলুন, কোথাও এই কথা প্রকাশ করিবেন না?

হীরালাল। আমার আবশ্যক কি? আপনার বীরত্ব বুঝিবার জন্যই এইরূপ বলিয়াছি। আপনি এখন নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাউন, রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর অতীত হয়।

অনন্তর স্নেহকে ক্লান্ত দেখিয়া, ইচ্ছাসত্ত্বেও, হীরালাল স্নেহের বিবাহ-সম্বন্ধে আর কোন কথা উত্থাপন করিলেন না। সকলে যথাস্থানে শয়নপূর্ব্বক রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

পরদিন প্রত্যুষেই যদুনাথের বাড়ীর ঘাটে বোট পৌঁছিল। তাঁহারা শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিলেন।

শিরোমণি মহাশয় তখনও নাসিকাধ্বনিতে চতুর্দ্দিক কাঁপাইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। হীরালাল তাঁহার নিকট যাইয়া কহিলেন, "মহাশয়! গাত্রোত্থান করুন, বেলা হইয়াছে।"

"হাঁ তাইতো, বেলা হইয়াছে যে!" এই বলিয়া শিরোমণি মহাশয় উঠিয়া বসিয়া, দুই হস্তে চক্ষু রগড়াইয়া কহিলেন, "এ কোথায় আসিয়াছি? এ যে আমাদের ঘাটের মত বোধ হইতেছে। হাঁ, আমাদের ঘাটই তো। তবে, মহাশয়, আমি এখন যাই।"

হীরালাল বলিলেন, "হাঁ যান। পিসামহাশয়কে আমাদের আগমন সংবাদ শীঘ্র দিবেন।"

শিরোমণি মহাশয় আপনার ভাঙ্গা ছাতি ও ছেঁড়া পাদুকা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

স্নেহের জননী, আপনার প্রাণপ্রিয়া নয়নতৃপ্তিদায়িনী—যাহাকে অবলম্বন করিয়া, যাহার সুধাংশু-বদন দেখিয়া জীবিতা ছিলেন—সেই স্নেহের পুত্তলি স্নেহলতাকে হারাইয়া, মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেছেন, ও চীৎকার করিতেছেন। আহা! তাঁহার তৎকালীন অবস্থা বর্ণনাতীত। যদুনাথ পার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন ও নানা রূপ প্রবোধ দিতেছেন। এইরূপ সময়ে শিরোমণি মহাশয় হীরালালের আগমনবার্ত্তা ও তাঁহার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ এবং স্নেহকে ফিরাইয়া আনা—ইত্যাদি কহিলেন। সেই সঙ্গে আপনার বীরত্বের কথাটাও প্রকাশ করিতে ভুলিলেন না।

যদুনাথ এই সমুদয় অভাবনীয় ঘটনায় বিস্মিত ও চিন্তিত হইলেন। তখনি হীরালাল ও স্নেহকে নৌকা হইতে উঠাইয়া আনিতে কহিলেন।

শ্যামা এই সমুদয় শুনিয়া অতিরিক্ত আনন্দপ্রযুক্ত মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে স্নেহ ও হীরালাল সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। স্নেহ মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া মাতার কণ্ঠ জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মূর্চ্ছিতা শ্যামা প্রাণাধিকা তনয়ার স্পর্শমাত্র চৈতন্য লাভ করিলেন এবং কন্যারত্নকে আপনার ক্ষীণ-হস্তদ্বারা বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

স্নেহলতা, লতার ন্যায় মাতার কণ্ঠাবলম্বন করিয়া, রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "মা! আমি কি তোমার চিরদিন দুঃখ দিতে জন্মিয়াছি? আর দুঃখ পাইও না, মা! দুঃখ কিসের? নিষ্কামী হও।"

শ্যামা স্নেহের বিমলমুখচন্দ্র চুম্বন করিয়া কহিলেন, "ছিঃ মা, অমন কথা কি বলিতে আছে? তোর মত সুখ আমায় কে দিতে পারে? তুই যে আমার সুখের খনি। আহা! এই হতভাগিনীর গর্ভে জন্মিয়া তুই এক দিনের জন্যও সুখী হইতে পারিলি না।"

তাঁহাদের এইরূপ সন্তাপপূর্ণ ঘটনা অবলোকন করিয়া হীরালালের গণ্ড বহিয়া অশ্রুর পর অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল। ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস কিঞ্চিৎ থামিলে শ্যামা হীরালালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "বাবা হীরা! এত দিন পরে কি তোর এই অভাগিনী পিসীমাকে মনে পড়িল? দাদা যে আমায় এক দিন না দেখিলে থাকিতে পারেন না! আমি না হইলে যে তোদের সংসার একদিনও চলিত না!"

হীরালাল শ্যামার চরণ বন্দনা করিয়া কহিলেন, "আর কেন কষ্ট দেন? আপনাদের অবস্থা দেখিয়া আমি বড়ই দুঃখ ভোগ করিতেছি। শুদ্ধ আমাদেরই দোষে এই সমুদয় হৃদয়বিদারক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। চলুন, এখন আর এক দিনও এখানে থাকা হইবে না। উঃ কি নির্দ্দয়তা!"

শ্যামার আজ এই রুগ্ন দুর্ব্বল শরীরে বলের সঞ্চার হইয়াছে। শ্যামা আজ প্রায় এক মাসের পর শয্যায় উঠিয়া বসিলেন।

হীরালাল কহিলেন, "স্নেহ, পিসিমাকে কিরূপে বোটে উঠান যায়, বল দেখি?"

শ্যামা। এই নিকটেই ঘাট। আমার হাত ধরিয়া লইয়া গেলে আমি স্বচ্ছন্দে যাইতে পারিব, তুমি আমায় লইয়া চল।

তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া স্নেহ বলিলেন, "মা! আমি তবে সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া আসি।"

এই বলিয়া স্নেহ, সেই স্থান হইতে উঠিয়া, যথানিয়মে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। গিরিবালার নিকট গিয়া দেখিলেন, তিনি যাইবেন শুনিয়া গিরি কাঁদিতে কাঁদিতে আপন বড়-বড় চক্ষু দুইটি লোহিতবর্ণ করিয়াছেন। স্নেহ গিরিকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি গিরির নিকট গিয়া তাঁহার গলদেশ ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, "ভাই! কাঁদিতেছ কেন? তুমি না বলিয়াছিলে আমি এই যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার হইলে তুমি বড় সুখী হইবে? তবে আর কাঁদ কেন, দিদি?"

গিরি। ভাই প্রাণে প্রবোধ মানিতেছে না, স্থির থাকিতে পারিতেছি না। আহা! কাল সারাদিন তোমায় না দেখিয়া, তোমার অবস্থা ভাবিয়া, আমি ব্যাকুল হইয়া পাগলীর মত বেড়াইয়াছি। তোমায় না দেখিয়া আমি কেমন করিয়া থাকিব?

স্নেহ। আমার উদ্ধার হইতেছে জানিয়া ধৈর্য্য ধর, বোন্! বাঁচিয়া থাকিলে আবার দেখা হইবে।

এই বলিয়া স্নেহ আপনার গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সত্বর একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত বাক্স আনিলেন এবং তন্মধ্যে তাঁহার যে সকল বহুমূল্য অলঙ্কার ছিল তাহা এক-একখানি করিয়া গিরিকে পরাইতে লাগিলেন।

গিরি। ও কি কর? ও কি কর? এগুলি আমি লইব না, ভাই।

স্নেহ। ছিঃ বোন্, এই বুঝি তোমার ভালবাসা? আমি ভালবাসিয়া দিতেছি। তোমায় লইতে হইবে।

ইতিমধ্যে নিরুপম সেই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং স্নেহকে দেখিবামাত্র কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাহার সঙ্গে গিরি এবং স্নেহও কাঁদিতে লাগিলেন। স্নেহ চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, "নিরুদা! আমার জন্য তুমি অনেক কষ্ট পাইয়াছ! তুমি আমার দুঃখে দুঃখী না হইলে আমার যে কি অবস্থা হইত জানি না।"

নিরু। এক দিনের জন্যও তোমায় সুখী করিতে পারি নাই। এই নির্দ্দয়দের নিকট আসিয়া কেবল কষ্টের বোঝাই বহিয়া গেলে। কল্যকার ঘটনা মনে পড়িলে এখনও আমি অস্থির হইয়া যাই।

তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, ইতিমধ্যে একজন রমণী আসিয়া স্নেহকে বলিলেন, তাঁহার জননী তাঁহাকে ডাকিতেছেন। স্নেহ নিরুপমকে কহিলেন, "নিরুদা! চলিলাম, সর্ব্বদা চিঠি-পত্র লিখিও।"

অনন্তর স্নেহ সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া যদুনাথকে প্রণামপূর্ব্বক মাতা ও ভ্রাতার সহিত বোটে উঠিলেন। যদুনাথ এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ হইতে একটীও বাক্য নিঃসৃত হইল না।

নিরুপম, গিরি প্রভৃতি তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে বোট পর্য্যন্ত গেলেন। যতক্ষণ বোট দেখা গেল ততক্ষণ তাঁহারা চাহিয়া রহিলেন। বোট অদৃশ্য হইলে তাঁহারা কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

——:*:—

ভাই বোনে।

সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় জগত আঁধারে পূর্ণ হইল। দেখিতে দেখিতে দুই একটি করিয়া অসংখ্য-তারকামালায় অনন্ত আকাশ ছাইয়া পড়িল। অপূর্ব্ব শোভা! আকাশ সিংহাসন সাজাইল, মন্দ-সমীরণ ব্যজন করিতে লাগিল, তরঙ্গমালা শতকণ্ঠে সুমধুর সঙ্গীতে মাতিয়া উঠিল। অসংখ্য ফুল সুঘ্রাণে দশদিক আকুল করিয়া ফুটিয়া উঠিল। বিশ্বময় এ কি কাণ্ড! কাহার ইঙ্গিতে জগত প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন বেশ ধরিতেছে? জীব সুখের স্বপ্নে বিভোর থাকে অথবা দুঃখের স্বপ্নে ক্লিষ্ট থাকে, সময় প্রতি মুহূর্ত্তে বিশ্বনিয়ন্তার ইঙ্গিতে অনবরত তাহাকে নূতন ভাব আনিয়া দিতেছে।

আজ স্নেহ বোটে উঠিয়া অবধি কত কথাই কহিতেছেন। কখন বাড়ীর কথা কহিতেছেন। কখনও মাতুলালয়ের সংবাদ, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া, হীরালালের নিকট শুনিতেছেন। শ্যামার অবস্থা অন্যরূপ। তাঁহার প্রাণ আর শান্তি মানিতেছে না। তিনি কখনও শয়নে, কখনও উপবেশনে ভাবিতেছেন,—"হায়! কেন আসিয়াছিলাম? একমাত্র প্রাণাধিকা, সংসারের সম্বল স্নেহ আমার, তোমার সুখ-শান্তি

পদ্মার এই অগাধ সলিলে নিক্ষেপ করিয়া গেলাম! ভগবান্! তোমার মনে কি এই ছিল? স্নেহ যে আমার, তোমার চিরদাসী। তার কি এই পুরস্কার করিলে? দাদার কাছে গিয়া কি বলিব? লোকের নিকটেই বা কি বলিয়া মুখ দেখাইব?"

হীরালাল শ্যামার অবস্থা বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। তিনি সারা দিন আর কোন প্রকারেই স্নেহলতার বিবাহের কথা, জানিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও, উত্থাপন করিতে সাহসী হইতেছেন না। স্নেহের নিকটেই সমুদয় দিন বসিয়া আছেন। এক-একবার স্নেহলতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন। সেই নিশ্বাসেই স্নেহ তাঁহার দাদার হৃদ্‌গত সমুদয় ভাব বুঝিয়া লইতেছেন। তাই আরও প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া নিষ্কামী বালিকা দাদার মন ভুলাইতেছেন।

সন্ধ্যার পর রাত্রির আহারাদি শেষ হইয়া গেল। শ্যামা স্নেহকে শয়নের জন্য ডাকিলেন। স্নেহ বলিলেন, "মা, তোমার অসুখ, তুমি ঘুমাও। আমি দাদার সঙ্গে একটু গল্প করি।" শ্যামা শয়ন করিলেন।

ভাই-বোনে বোটের ছাদের উপর গিয়া উপবেশন করিলেন। অনেকক্ষণ কথা-বার্ত্তার পর হীরালাল একখানি লিপি স্নেহের হাতে দিলেন।

স্নেহ কহিলেন, "কার চিঠি, দাদা?"

"অমৃত বাবুর।"

'অমৃত' নামটি শুনিয়া, মুহূর্ত্তের জন্য একবার বালিকার প্রাণটি কাঁপিয়া উঠিল।

হীরালাল একটি দীপ আনিয়া ধরিলেন। স্নেহ চিঠিখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ঈষৎ হাসিলেন।

হীরালাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাস কেন, দিদি?"

"মা দুই জনকে একই ব্রতে দীক্ষিত করিয়াছেন" এই বলিয়া, স্নেহ, চিঠি খানি বন্ধ করিয়া, হীরালালের হস্ত হইতে দীপটি লইয়া, বোট মধ্যে রাখিয়া আসিলেন।

হীরালাল স্নেহলতার চরিত্রের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় স্নেহ কহিলেন, "দাদা, কি ভাবিতেছ?"

হীরালাল ধীরে ধীরে স্নেহের হাতখানি ধরিয়া আপন পার্শ্বে বসাইলেন। ধীরে ধীরে কহিলেন, "দিদি, কোন্ উপাদানে তোমার হৃদয় গড়িয়াছ? এ দেবারাধ্য অমূল্য রত্ন কোথায় পাইলে? তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া অবধি শত চেষ্টার পর চিঠিখানি তোমার হাতে দিলাম, আর তুমি হাসিলে?"

স্নেহ ধীরে ধীরে কহিলেন, "দাদা ক্লেশ, নাই, দুঃখ নাই, নিষ্কামী হও।"

হীরালাল, স্নেহের ক্ষুদ্র হস্ত আপন হস্তে লইয়া, কহিলেন, "দিদি আমার, তুমি কি বলিতেছ? প্রাণ খুলিয়া সব বলিয়া, অধীর দাদাকে শান্ত কর।"

স্নেহ সেই নীরবতাময় নদীবক্ষে, দাদার হস্ত-মধ্যে আপন ক্ষুদ্র হস্ত, রাখিয়া তাঁহার স্নেহমাখা বদনখানির প্রতি অনিমিষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। হীরালাল অস্পষ্ট-তারকালোকে দেখিলেন, স্নেহলতার সেই আয়তনয়নদ্বয় হইতে স্বর্গের জ্যোতি বিভাসিত

হইতেছে। সমুদয় বদনমণ্ডল কি এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। মস্তকোপরি সুনীল গগনে নক্ষত্রমণ্ডল হাসিতেছে। সমীরণ, ধীরে সুধীরে হরিৎময় বৃক্ষপত্র কাঁপাইয়া, পুষ্পের সুঘ্রাণ বহিয়া, প্রবাহিত হইতেছে। নিম্নে নদীসুন্দরী, স্তরে স্তরে তারকাহার বক্ষে লইয়া, আনন্দে কুলু-কুলু শব্দে নৃত্য করিতে করিতে বহিয়া যাইতেছে। থাকিয়া থাকিয়া দুই দিক হইতে দুই দল বসন্তের কোকিল উঠিল। পাপিয়া, সুদূর-বিস্তৃত আকাশমার্গে পক্ষবিস্তারপূর্ব্বক, সপ্তসুর চড়াইয়া, দিক্ হইতে দিগন্তরে চলিয়া গেল। এই গম্ভীর জগতে গাম্ভীর্য্যমাখা দুইখানি ছবি, পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, কে জানে কি গভীর ভাবে মগ্ন! বোটের ছাদের এক পার্শ্বে মাঝি-মাল্লারা গভীর-নাসিকা-ধ্বনি সহযোগে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন।

বহুক্ষণ পরে স্নেহলতা বলিয়া উঠিলেন, "দাদা! দাদা! কি শুনিবে তুমি? কেমন করিয়া আমি সেই ভাষাহীন ভাষা বলিব? কেমন করিয়াই বা সেই অপরূপ ভাব আমি প্রকাশ করিব?"

হীরালাল বলিলেন, "দিদি, তোমার সুনির্ম্মল প্রাণের কাহিনী যাহা পার বল।"

তখন সেই পদ্মা-তীরে আপন ব্রত ধারণ, মায়ের সমাবেশের কথা, মায়ের সুমধুর আশীষ—বালিকা দাদার কাছে সকলি বলিল। বলিতে বলিতে বালিকার গণ্ড বহিয়া প্রেমাশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সরলা বালিকার মহাভাবের উদয় হইল। বালিকা যুক্তকরে, ঊর্দ্ধনেত্রে গদ্‌গদকণ্ঠে, মায়ের মহিমা গাইয়া উঠিলেন। সেই অপূর্ব্ব গাথা

শুনিয়া কাহার প্রাণ স্থির থাকিতে পারে? হীরালালের প্রেমময় প্রাণ আর স্থির থাকিতে পারিল না। বালিকার সুকণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া, ঊর্দ্ধনয়নেও যুক্তকরে, মহিমাগানে মত্ত হইলেন। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সমুদয় চরাচরে সুধা বর্ষিত হইতে লাগিল। অন্তরে সুধা, বাহিরে সুধা, সুধামাখা ছবি দুইখানি। এ তাপময় সংসারে যে তোমা-দিগকে দেখিবে সে জানিবে, সুধার খনি কোথায়। অনেক ক্ষণ পরে উভয়ে, গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া, মাতার অভয় চরণে প্রণিপাত করিলেন।

হীরালাল কহিলেন, "দিদি আমার! তুমি আজ আমায় নূতন জীবন দিলে। আমার অসার বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানে এমন ভাষা নাই, যাহা বলিয়া তোমায় আশীর্ব্বাদ করিতে পারি।"

"দাদা! ক্ষুদ্র আমি, কেন আমায় বাড়াও?"—বলিতেই বালি-কার গণ্ড বহিয়া আবার দুই ফোঁটা প্রেমাশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

"দিদি, ক্ষুদ্র তুমি? তোমার ন্যায় অমূল্য রত্ন যাহার নাই, তাহার আবার আছে কি? সে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান অধঃপাতে যাউক যাহাতে এ হেন অতুল অমূল্য সম্পত্তির অভাব।"

তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, ইতিমধ্যে শ্যামা আসিয়া বলিলেন, "হিরু! তোমরা এখনও এখানে বসিয়া আছ? শুইতে আইস। হিমে রাত্রি জাগরণে অসুখ করিবে।"

তখন সকলেই বোট-মধ্যে গিয়া শয়ন করিলেন। বোটস্থিত ঘটিকা-যন্ত্রে ঠং করিয়া একটা বাজিল।

অল্পক্ষণ মধ্যেই সকলে বিশ্বজননীর, ক্রোড়ে শয়নপূর্ব্বক নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু স্নেহলতার চক্ষে আজ আর নিদ্রা আসিতেছে না।

কত কথাই তাঁহার হৃদয় দিয়া অনবরত বহিয়া যাইতেছে। কতক্ষণ পরে, কি জানি কি মনে করিয়া, ধীরে ধীরে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, বাহিরে আসিলেন। যেন কাহাকে অন্বেষণার্থে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তৎপরে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া—যাঁহাকে খুঁজিতে ছিলেন, তাঁহাকে যেন না পাইয়া—কেমন এক প্রকার শূন্যতা উপলব্ধি করিয়া নিরাশচিত্তে বসিয়া পড়িলেন। ক্ষুদ্র দুই খানি হস্তে আপন চক্ষু দুইটি আবৃত করিলেন। কতক্ষণ পরে অজস্র ধারে হস্ত মধ্য দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

বালিকা উদ্বেলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "অমৃত! অমৃত! জীবন-সর্ব্বস্ব! ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি—আমার জন্য তোমার বীরত্বপূর্ণ, প্রতিভাশালী জীবন নিষ্প্রভ হইল। আমি এখন কি করিব?"

বালিকা বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। পরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কহিলেন, "লিখিয়াছেন, 'তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা না করিলে আমি কদাচ এ সংসারে সুখী হইতে পারিব না।'—ছিঃ ইহা উপযুক্ত হয় নাই।"

আবার বালিকার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কহিলেন, "আমি বড় অধম। বিমল হস্তে যাহা লিখিত হইয়াছে, পবিত্রতাপূর্ণ হৃদয়ের ভাব যাহাতে প্রকাশ পাইতেছে, তাহাকে বলিলাম—"ছিঃ!" আমার বড় আস্পর্দ্ধা!"

বালিকা অধীরভাবে চিঠিখানি বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। পরে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, যেন কিছু লজ্জিত হইলেন। কে যেন তাঁহাকে ধিক্কার দিয়া বলিল,

"ছিঃ—এই কি তোমার মাতৃ-আজ্ঞা পালন? মা তোমায় বলিয়াছেন, "ধৈর্য্য ধর—নিষ্কামী হও।"

আবার সেই আঁধার রজনীতে বালিকার গণ্ড বহিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। বালিকা, আবার ক্ষুদ্র হস্ত দুইখানি যুক্ত করিয়া, বিচিত্র অসীম-আকাশ-পটে চাহিয়া রহিলেন। একাগ্রচিত্তে, ব্যাকুলহৃদয়ে, অনন্ত আকাশ খুঁজিতে খুঁজিতে, বালিকা, ক্ষুদ্র রেণুর ন্যায় অনন্তে মিশিয়া গেলেন। তৎপরে বালিকা বিহ্বলহৃদয়ে কহিতে লাগিলেন, "মা গো শঙ্করি! আমি তোমার কাছে যাইব, মা! শুনিয়াছি, মৃত্যুকামনা তোমার অপ্রিয়। কিন্তু মা অন্তর্যামিনী, তুমি তো জান, আমি কেন যাইতে চাহিতেছি। আমি এ অবস্থায় এখানে থাকিলে যে, তোমার প্রিয় পুত্রের জীবনব্রতের কণ্টক হইব। আমি জ্ঞানহীনা—ক্ষুদ্র; শুভাশুভ কি বুঝি? যাহাতে তাঁহার জীবনের কল্যাণ হয়, দয়াময়ী মা! তুমি তাই কর। আমি আবার কি প্রার্থনা করিব? তুমি যাহা করিবে তাহাই শুভ। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হউক।"

জগতের অন্ধকার কথঞ্চিৎ বিদূরিত করিয়া, একাদশীর অল্লাবৃত চন্দ্রমা চুপে চুপে নীলাম্বরে উদিত হইল।

রজনী অবসানপ্রায়। মাঝি উঠিয়া মাল্লাদিগকে ডাকিল, "জোয়ার আসিয়াছে, উঠিয়া বোট ছাড়িয়া দেও।"

স্নেহ বিশ্বজননীর চরণে প্রণামপূর্ব্বক, বোটমধ্যে গিয়া, মাতার পার্শ্বে শয়ন করিলেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

শুভ বিবাহ।

অমৃতলাল স্বীয় অদৃষ্টের পরিণাম বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি আপনার মানসিক অবস্থা অতি শোচনীয় অনুভব করিয়া, কয়েক দিন মধ্যেই, মৃজাপুর চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে এত শীঘ্র ফিরিতে দেখিয়া, সুশীলকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত শীঘ্র যে?"

অমৃতলাল কহিলেন, "শুভকার্য্য শীঘ্র হওয়াই কর্ত্তব্য, এইরূপ বিবেচনা করিয়া, তোমাদের হারে গাঁথিতে আসিয়াছি। এখন চল, বাড়ীর মধ্যে যাওয়া যাক্।"

সুশীলকুমার তাঁহার কথা-বার্ত্তা ভাবগতিক দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। তিনি অমৃতলালের সব কেমন এক প্রকার নূতন-নূতন বোধ করিতে লাগিলেন; তাঁহার কথায় ও হাস্যের মধ্যে কেমন এক প্রকার শূন্য ভাব প্রকাশ পাইতেছে। বুদ্ধিমান্ সুশীলকুমারের নিকট অমৃতলালের এই নূতন ভাব ভাল লাগিল না। তিনি অন্তরে ব্যথিত হইলেন; কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। অনন্তর তাঁহারা বাড়ীর মধ্যে—যেখানে চক্রবর্ত্তী মহাশয় মুদ্রিতনয়নে তাকিয়ায় ঈষৎ হেলিয়া মালা জপিতেছিলেন,

ও মোহিনী তাঁহার সন্নিকটে বসিয়া তাঁহার ছিন্নজপমালা গাঁথিতে-ছিল—সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহাদিগকে বসিতে সঙ্কেত করিলেন। তাঁহারা উভয়ে উপবেশন করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে অমৃতলাল পিতাকে কহিলেন, "পুরোহিত ডাকিয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়া ফেলুন।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঈষৎ হাস্যের সহিত কহিলেন, "ভাল।"

তৎপরে ভৃত্যকে ডাকিয়া পুরোহিত মহাশয়কে সংবাদ দিতে অনুমতি করিলেন। মোহিনী, আপন বস্ত্রাঞ্চলে মালাগুলি লইয়া, ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অল্পক্ষণ মধ্যে পুরোহিতসঙ্গে ভৃত্য উপস্থিত হইল। পুরোহিত মহাশয়কে সাদরে আসনে উপবেশন করাইয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন, "দেখুন, ত মহাশয়, এই বৈশাখ মাসের প্রথমে বিবাহের দিন আছে কি না?"

পুরোহিত মহাশয় পঞ্জিকার পাতা উল্টাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিবার পরে কহিলেন, "দোসরা বৈশাখ বিবাহের একটা উত্তম দিন আছে।"

অমৃতলাল কহিলেন, "উত্তম হইয়াছে। আমি অদ্য হইতেই আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলাম। দিন অতি অল্পই আছে, মাঝে মাত্র দশ দিন আছে।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন, "দিনটা এত শীঘ্র স্থির করিলা ফেলিলে? সুশীলের মাতুল রায় মহাশয়কে একটা সংবাদও দেওয়া হইল না।"

সুশীলকুমার কহিলেন, "এত শীঘ্র না হইলেই ভাল হইত।"

তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় সুশীলকুমারের পিতা অক্ষয়কুমার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহাকে অতি সমাদরে স্বীয় পার্শ্বে বসাইয়া বিবাহের বিষয় তাঁহাকে সবিশেষ জ্ঞাত করাইলেন।

অক্ষয়কুমার সমুদয় শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "শুভ কার্য্য যত শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া যায়, ততই ভাল। আমার বিবেচনায় দোসরা বৈশাখই উত্তম দিন।

সকলের সম্মতিক্রমে বিবাহের ঐ দিনই স্থির হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ চুনীলালের নিকট টেলিগ্রামে সংবাদ পাঠান হইল। অমৃতলাল মাতার নিকটে শুভ সংবাদ প্রদান করিলেন। তিনি অতি আনন্দিতা হইয়া, পাড়ায় যে দুই এক ঘর বাঙ্গালী প্রতিবেশিনী ছিলেন তাঁহাদিগকে এই শুভ সংবাদ দিয়া, সবিনয়ে কহিলেন, "তোমাদের ভরসাতেই আমার এই কাজ। আমার মোহিনীকে তোমরা যেমন ভালবাস, আর আমাদের যেরূপ শ্রদ্ধা কর, তাহাতে তোমাদের আর অধিক কি বলিব?"

তাঁহার এই মধুর সরল বচনে সকলেই আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে উৎসাহিতা করিলেন। অনন্তর পাড়ার আর আর স্ত্রীলোকদিগকে ডাকাইয়া, এই শুভ কার্য্যে যোগ দিতে অনুরোধ করিলেন। সকলেই আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া উৎসাহের সহিত নানাবিধ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে কয়েকটা দিন চলিয়া গেল। বিবাহের দিন

আসিয়া উপস্থিত হইল। আমোদ-আহ্লাদে যথাবিহিত বিবাহ-কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। অমৃতলাল নিশ্চিন্ত হইলেন।

বিবাহের চার-পাঁচ দিন পরে, এক দিন অপরাহ্নে অমৃতলাল ও সুশীলকুমার তাঁহাদের গৃহের ছাদের উপর বসিয়া নানা প্রকার আলাপে প্রবৃত্ত আছেন, এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া অমৃতলালের হস্তে একখানি কাগজ প্রদান করিল। অমৃতলাল দেখিলেন, হীরালাল তাঁহাকে আসিবার জন্য জরুরি টেলিগ্রাম করিয়াছেন।

অমৃতলাল বলিলেন, "আমি যাইবার জন্য প্রস্তুত হই। যেরূপ লিখিয়াছেন, আমাকে অদ্যই যাইতে হইবে।"

তিনি আপন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার দ্রব্যাদি ঠিক করিলেন। নানাপ্রকার ভাবনা আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিল। তিনি ভাবিলেন,হীরালাল তাঁহাকে এইরূপ ভাবে টেলিগ্রাম করিয়াছেন কেন? তাঁহাদের কাহারও কি কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে? তাহাই সম্ভব। কাহার কি হইল? সম্ভবতঃ স্নেহেরই অমঙ্গল হইবে। তাঁহার মস্তিষ্ক ঘুরিতে লাগিল, সমুদয় শরীর অধীর হইয়া পড়িল, প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই আশা-কুহকিনী মধুর স্বরে তাঁহার কানে কানে কি কহিল। অমনি তিনি মনে করিলেন,—আমি সুধু-সুধু অমঙ্গল-চিন্তা করিতেছি কেন? হয় তো স্নেহের কোন অসুখ হয় নাই, হয় তো তাহার বিবাহ হয় নাই। বোধ হয় আমাদের শুভ-সম্মিলনের জন্যই কথা গোপন রাখিয়া, হীরালাল বাবু আমাকে যাইবার জন্য লিখিয়াছেন। তাঁহাদের হৃদয় মধ্যে মুহূর্ত্তের মধ্যে এক অপূর্ব্ব আনন্দের ভাবের উদয় হইল, তাঁহার যেন বল ও শক্তি ফিরিয়া

আসিল। তিনি সকলের নিকট বিদায় লইয়া রাত্রের ট্রেণেই রওনা হইলেন।

ভগবান জানেন, অনৃতলালের অনুমানের পরিণাম কি!

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

রোগশয্যা।

পাঠক মহাশয়! অনেক দিন চুনিলাল মহাশয়ের অট্টালিকায় প্রবেশ করেন নাই। চলুন, একবার তথায় গিয়া দেখি।

অট্টালিকার সম্মুখস্থ রাজপথে সেই রূপেই লোক-জন ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে যাতায়াত করিতেছে। পার্শ্ব দিয়া কল্লোলিনী জাহ্নবী, অসংখ্য-বীচিমালা বক্ষে ধারণ করিয়া, সেই রূপেই বহিয়া যাইতেছে। গঙ্গার বক্ষ দিয়া, মাঝিরা, সেই রূপেই উচ্চ কণ্ঠে গীত গাহিতে গাহিতে তরণী সকল বাহিয়া যাইতেছে। চুনিলালের বাড়ী প্রবেশের রাস্তার দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ ঝাউগাছ সকল উন্নতমস্তকে বায়ুভরে সেই রূপই সোঁ-সোঁ শব্দ করিয়া হেলিতেছে—দুলিতেছে। পার্শ্বস্থ কদম্ববৃক্ষে সেই দুইটি পাপিয়া মুখামুখী হইয়া, উচ্চকণ্ঠে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া, সেই রূপেই মধুমাখা গীত গাহিতেছে। সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যানে মালিরা পূর্ব্বের ন্যায়ই জল সেচন করিতেছে। সকলি সেই—তবু যেন কি নাই। কি সে? সে আনন্দ! আর সে সকল আনন্দ-বদন দৃষ্ট হইতেছে না, আর সে সুমধুর-গীতধ্বনি শুনা যাইতেছে না, আর সেই সুমধুর-হাস্য-কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতেছে না। আর কোন সুধাংশু-বদন

বাতায়ন-সন্নিধানে দাঁড়াইয়া জাহ্নবীর প্রতি চাহিয়া থাকে না। সমুদয় আনন্দ-কোলাহল হাস্য-গীত, সুখ-শান্তি, যেন কোন নিষ্ঠুর দস্যু-কর্ত্তৃক চিরদিনের জন্য অপহৃত হইয়াছে। এই প্রকাণ্ড প্রাসাদ উচ্চ মস্তকে কেমন একপ্রকার হাহাকার ভাব প্রকাশ করিতেছে। কেবল দাস-দাসীগণ ম্লানমুখে শঙ্কিতভাবে ব্যস্ততাসহকারে স্বীয় স্বীয় কার্য্যে তৎপর রহিয়াছে।

স্নেহলতা অতিশয় পীড়িতা। দ্বিতলস্থ একটি বৃহৎ কক্ষে, একখানি বিস্তৃত পর্য্যঙ্কোপরি তাঁহার সেই রুগ্ন, ক্ষীণ তনুখানি শায়িত। শয্যার এক পার্শ্বে শ্যামা ও ঊষাবতী, বিষম উৎকণ্ঠিতা হইয়া, স্নেহলতার সেই ক্ষীণ-দেহলতার প্রতি অনিমিষে চাহিয়া বসিয়া আছেন। অপর পার্শ্বে দুই-তিন জন ডাক্তার বসিয়া রহিয়াছেন। ভয়ানক জ্বরের প্রকোপ। বালিকা যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। শ্যামা অনবরত অশ্রুমোচন করিতেছেন ও প্রাণপণে উদ্বিগ্ন অন্তরে শুশ্রূষা করিতেছেন।

একখানি শকট আসিয়া বাড়ীর সিংহ-দরজায় দাঁড়াইল। তাহা হইতে একজন ইংরেজ ও একজন বাঙ্গালী নামিলেন। হীরালাল তাঁহাদের আগমন জানিয়া, নীচে আসিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া উপরে গেলেন।

ইঁহারা ডাক্তার, এই মাত্র কলিকাতা হইতে আসিলেন। হীরালাল ডাক্তারদ্বয় সমভিব্যাহারে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তারগণ পরীক্ষায় যাহা বুঝিলেন, তাহাতে বিষম শঙ্কিত হইলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক অন্য এক কক্ষে একত্র হইয়া, পরামর্শ করিয়া ঔষধ লিখিয়া দিলেন। হীরালাল তখনই

ঔষধ আনিতে লোক প্রেরণ করিলেন। অনন্তর ডাক্তারগণ পুনর্ব্বার রোগীর শয্যা-পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন এবং বারংবার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

শ্যামা অধীর হইয়া বার-বার ডাক্তারদিগকে অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতে ও পাগলিনীর ন্যায় নানাপ্রকার অসংলগ্ন কথা কহিতে লাগিলেন। তাঁহার ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া সকলেই মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে স্নেহ একবার মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। শ্যামা প্রাণ-পুত্তলিকে জ্ঞানবিলুপ্তা দৃষ্টে একেবারে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার এই ক্রন্দন-শব্দে চুনিলাল দ্রুতপদে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শ্যামাকে নানাপ্রকার আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "স্নেহ মূর্চ্ছিতা হইয়াছে মাত্র। এখনই জ্ঞান লাভ করিবে।"

ডাক্তারদিগের যত্নে স্নেহ অতি শীঘ্রই চৈতন্য লাভ করিলেন। শ্যামা তখন স্নেহভরে কন্যার বদনের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, এবং সযত্নে স্নেহের শুষ্ক বদনে অল্প-অল্প দুগ্ধ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর চুনিলাল সাশ্রুলোচনে ডাক্তারদিগকে কহিলেন, "আমার এই বালিকা অমূল্য। আপনারা ইহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। এই বালিকা আরোগ্য লাভ করিলে আপনাদিগকে বিলক্ষণ পুরস্কৃত করিব। আর অধিক কি বলিব, আপনাদের শ্রমের মূল্য নাই।"

ডাক্তারগণ সবিনয়ে কহিলেন, "আপনি সে জন্য কিছু মনে করিবেন না। আমাদের কর্ত্তব্য আমরা করিতেছি এবং সাধ্যানুসারে করিব।"

ইতিমধ্যে হীরালাল ঔষধ লইয়া উপস্থিত হইলেন। ঔষধ সেবন করান হইল। যথা নিয়মে তিন-চারিবার ঔষধ সেবনের পর রোগের প্রকোপ অনেক পরিমাণে ভাল বোধ হইতে লাগিল।

ডাক্তার সাহেব কহিলেন, "রোগীর অবস্থা ক্রমেই ভাল বোধ হইতেছে, ক্রমে আরও ভাল হইবে আশা করা যায়। অতএব আমি এখন যাই, পুনরায় বৈকালে আসিব।"

এই বলিয়া, অপর দুই জন বাঙ্গালী ডাক্তারকে কিছু পরামর্শ দিয়া সেইখানে রাখিয়া চলিয়া গেলেন।

প্রেমময়ী স্নেহ ক্রমে ক্ষীণ স্বরে দুই একটি কথা কহিতে লাগিলেন। মাতার বদনের প্রতি করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "মা, তুমি কি কাঁদিতেছ?"

শ্যামা অবরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "না, মা! কাঁদিব কেন? তুমি ধীরে ধীরে বলত, তোমার এখন কি অসুখ করিতেছে?"

স্নেহ ধীরে ধীরে, মাতার হাতের উপর আপন হাতখানি রাখিয়া, মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমি ভাল আছি। দাদা কোথায়, মা?"

হীরালাল নিকটে আসিয়া কহিলেন, "কেন, স্নেহ? কেন ডাকিতেছ, দিদি?"

স্নেহ হীরালালের প্রতি সকরুণ-দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "এখনও তো কৈ আসিলেন না?"

হীরালাল স্নেহের কথার উত্তর দিবার আগেই, একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল, "অমৃত বাবু আসিয়াছেন।"

হীরালাল তাঁহাকে আনিতে দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া গেলেন। স্নেহ একবার মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিলেন। শ্যামাও, অমৃতলালের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া, বসনাঞ্চলে ঘন-ঘন চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

উষাবতী ঔষধ আনিয়া কহিলেন, "পিসিমা! স্নেহকে ঔষধ খাওয়ান।"

শ্যামা ঔষধ লইয়া স্নেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, স্নেহের সেই বড়-বড় চক্ষু দুইটি হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। শ্যামা ব্যস্ত হইয়া, বসনাঞ্চলে চক্ষু মুছাইয়া, ব্যাকুলভাবে কহিলেন, "মা! তুমি তো আমায় সর্ব্বদা প্রবোধ দাও। ছি, মা, ধৈর্য্য ধর—অধীর হইও না, অসুখ বাড়িবে।"

শ্যামা ঔষধ খাওয়াইয়া বেদানা দিলেন। স্নেহ মাথা নাড়িয়া অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এই সময়ে হীরালাল অমৃতলালকে সঙ্গে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অমৃতলাল শয্যাশায়িতা স্নেহের সেই শুষ্ক ক্ষীণ তনুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই সোণার শরীরের এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। তিনি দাঁড়াইতে অক্ষম হইয়া নিকটস্থ একখানি চৌকিতে বসিয়া পড়িলেন।

হীরালাল তাঁহার অবস্থা দেখিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "ভাই! অধীর হইয়া সর্ব্বনাশ করিও না। ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক স্নেহের কাছে গিয়া বোস।"

অমৃতলাল তাঁহার এই কথায় হঠাৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "কি বলিলে?"

হীরালাল পুনরায় কহিলেন "ধৈর্য্য ধরিয়া, স্থিরভাবে স্নেহের নিকট গিয়া বোস।"

অমৃতলাল ধীরে ধীরে স্নেহের শয্যাপার্শ্বে গিয়া বসিলেন। ধীরে ধীরে স্নেহের একখানি হস্ত আপন হস্তে লইয়া কহিলেন, "স্নেহ, এখন কেমন আছ?"

স্নেহের মুদ্রিত-নয়নদ্বয় হইতে পুনর্ব্বার দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

শ্যামা অধীরভাবে কহিলেন, "ছিঃ, মা, তুমি যে আমার বড় বুদ্ধিমতী। স্থির হইয়া অমৃতলালের কথার উত্তর দেও।"

হীরালাল সস্নেহে স্নেহের অশ্রু মুছাইয়া কহিলেন, "ছি, দিদি, তোমার এইরূপ অধীর হওয়া কি ভাল দেখায়?"

স্নেহ নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়া একবার অমৃতলালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিতে দেখিতে আবার তাঁহার সেই বিশাল-নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল।

অমৃতলাল স্বীয় মনোভাবে গোপন করিয়া কহিলেন, "স্নেহ, কি করিতেছ? তুমি এইরূপ অধীর হইলে আমার এখানে থাকা অকর্ত্তব্য হইবে।"

স্নেহ ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "কেন, আমি কি করিয়াছি?"

অমৃত। তোমার চক্ষে জল পড়িতেছে কেন? ইহাতে তোমার অনিষ্ট হইবে, অসুখ বাড়িবে।

স্নেহের শুষ্ক-ওষ্ঠদ্বয়ে মৃদু হাস্যের দেখা দিল। সে হাস্যের মর্ম্ম অমৃতলাল বুঝিলেন। তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, বদন-মণ্ডল ম্লান হইতেও ম্লানতর হইল।

স্নেহ হাসিয়া কহিলেন, "আমার কিছুই হইবে না। আমার চক্ষের জল মুছাইয়া দেও, আমি আর কাঁদিব না। মা বলিয়াছেন, 'ধৈর্য্য ধর—নিষ্কামী হও।' মা আমার সকল সাধ পূর্ণ করিয়াছেন, সকল প্রার্থনা শুনিয়াছেন—তবে আর কাঁদিব কেন? পৃথিবীর সকল আশা সফল হইল। আর আমার কোন দুঃখ নাই। মা আমার বড় দয়াময়ী। এখন আমি অতি আনন্দের সহিত তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত।"

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

---*---

স্বর্গারোহণ।

"এ নহে মরণ এ যে সুখের জনম।"

স্নেহ বুঝি আর বাঁচে না। পাড়ার মেয়েরা একত্র হইয়া বলিতেছে, "স্নেহ বুঝি আর বাঁচে না। ও কি সামান্য মেয়ে? উহার দেবাংশে জন্ম। ও এ পৃথিবীতে থাকিবে কেন? আমরা হতভাগীরাই চিরকাল থাকিব। আহা! এই বয়সে গুণই বা কত! এত সুখে থাকিয়া, পরের দুঃখে এত কষ্ট পাইতে আর কেহ কখন দেখে নাই। যেমন ভিতর তেমনই বাহির। আহা কি সুন্দর সরলতা! মুখে একটি কথা নাই! সকলের সঙ্গে কেমন অমায়িক ভাব। ভগবানের ইচ্ছায় সারিয়া উঠুক, তা না হ'লে শ্যামা কি আর বাঁচিবে।"

বাড়ীর দাস-দাসীরা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে কানা-কানি করিতেছে, "আহা! দিদিমণি আর বাচিল না! বাঁচিবে কেন? ওকি সামান্য মেয়ে, গা! দিদিমণি আমাদের ঘরের আলো। দিদিমণির মুখে কখন চড়া কথাটি শুনি নাই। আহা! দিদিমণি দুঃখীর মা-বাপ। এত দয়া-মায়া আর কখনও দেখি নাই। আহা দিদিমণি কি ছিল আর পোড়া বাঙ্গাল দেশে গিয়ে কি হ'য়ে এলো।

বাঙ্গাল দেশে গেলে কি আর কেহ বাঁচে, গা? আহা দিদিমণি স্বর্গের পুতুল! হে হরি ঠাকুর! আমাদের দিদিমণিকে সারাইয়া দাও, তোমার নামে পাঁচসিকা হরির লুট দিব।”

হীরালাল ভাবিতেছেন, “স্নেহ বুঝি আর থাকে না।” তাঁহার মমতাময় প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। তিনি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অবিরাম সেবা করিতেছেন।

উষাবতী সময়ে সময়ে অন্তরালে গিয়া রোদন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার প্রেমময় হৃদয় ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতেছে, “প্রাণের স্নেহ বুঝি আর বাঁচিল না!”

অমৃতলাল ভাবিতেছেন, “জন্মের মত বিদায় হইতে আসিয়াছি। স্নেহ—আমার সর্ব্বস্ব! আমায় ছাড়িয়া কোথায় যাও তুমি? তোমায় ছাড়িয়া আমিও এখানে অনেক দিন থাকিব না।”

শ্যামার মাথার ঠিক নাই, বুদ্ধির ঠিক নাই, ভাবিবারও শক্তি নাই। তাঁর যে কি অবস্থা তাহা ব্যক্ত করারও সাধ্য নাই।

তাঁহারা এইরূপ ঘোরতর যাতনায় সময় অতিবাহিত করিতেছেন, এমন সময় অকস্মাৎ বাড়ীর মধ্যে ‘পাগল’ ‘পাগল’ বলিয়া একটা কলরব উঠিল। হীরালাল উৎকণ্ঠিত হইয়া দ্রুতপদে গৃহের বাহির হইতে না হইতে দেখেন, পাগল কক্ষের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। হীরালাল দেখিয়া অবাক্ হইলেন। দেখিলেন, যদুনাথ শূন্যপদে, শূন্যগাত্রে মলিনবদনে, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত! তাঁহার সমুদয় শরীর কণ্টক-বিদ্ধ হইয়া শোণিত নির্গত হইতেছে। নেত্রদ্বয় জবাকুসুম-সদৃশ

রক্তবর্ণ, সহজে চেনা যায় না। যদুনাথ দ্রুতগতি গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিকট হাস্য করিয়া উঠিলেন। তাঁহার তৎকালীন শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া শ্যামা কাঁদিতে লাগিলেন।

হীরালাল মহা বিপদ বুঝিয়া, যদুনাথের হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "আপনি বাহিরে আসুন।"

যদুনাথ সবলে হস্ত ছড়াইয়া কহিলেন, "বুঝিয়াছি—তোরা আমার স্নেহকে চুরি করিবার পরামর্শ করিয়াছিস! না—না, তাহা হইবে না। চুরি করিস্ না—তোদের পায়ে পড়ি, স্নেহ—আমার সোণার স্নেহ—কাঁদিবে যে!" এই বলিয়া ভয়ানক চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

গৃহস্থিত সমুদয় লোক তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। হীরালাল ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া পুনরপি যদুনাথের হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "বাহিরে আসুন, আপনাকে অনেক কথা বলিব।"

যদুনাথ সজোরে হীরালালের হস্ত ছাড়াইয়া কহিলেন, "না, না, আমি আর তোদের কথা শুনিব না, তোরা চোর। তোদের সর্ব্বনাশ করিব—শীঘ্র আমার স্নেহকে আনিয়া দে! তোরা গান শুনিবি?"

এই বলিয়া পাগল নাচিয়া নাচিয়া গাহিল—

"স্নেহ আমার জীবনের ধন,
কোন্ চোরে তারে করিল হরণ,
সে যেরে আমার সোণার বরণ,
তারি জন্য মোর জীবন ধারণ।"

স্নেহ একদৃষ্টে পিতার বিকৃতাবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার কপোল বহিয়া অশ্রু-বিন্দু গড়াইয়া পড়িতেছিল এবং অধরোষ্ঠ কাঁপিতেছিল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃদু-কম্পিত-স্বরে কহিলেন, "বাবা! তুমি কেন এইরূপ হইলে? আমি এই যে, বাবা!"

হীরালাল কহিলেন, "স্নেহ, তুমি কথা কহিও না, দিদি!—ও কি তোমার চক্ষে জল কেন?"

শ্যামা ব্যস্ত হইয়া স্নেহের অশ্রু মুছাইয়া দিলেন।

হীরালাল যদুনাথকে কহিলেন, "আপনার স্নেহ যে আপনাকে ডাকিতেছে। আপনি কি শুনিতে পাইতেছেন না?"

যদুনাথ কহিলেন, "তোরা রাক্ষস—তোরা পিশাচ—তোরা চোর! আমার ননীর পুতুলকে চুরি করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছিস্।"

এই বলিয়া পাগল ক্রমাগত কাঁদিতে লাগিল। হীরালাল দেখিলেন, বিষম বিপদ। তখন যদুনাথের হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "আসুন, আপনার স্নেহকে দেখিবেন।"

এই বলিয়া স্নেহের শয্যাপার্শ্বে লইয়া কহিলেন, "এই যে আপনার স্নেহ।"

পাগল অনিমিষলোচনে স্নেহলতার প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তৎপরে অমৃতলালের প্রতি চাহিয়া দন্ত-ঘর্ষণপূর্ব্বক কহিলেন, "তুই চোর! আমার স্নেহকে চুরি করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছিস্। এ কখনও আমার স্নেহ নহে।"

পিতৃবৎসলা স্নেহলতা পিতার ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা আর দেখিতে পারিলেন না। নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া কহিলেন, "আহা! বাবার

আমি এমন অবস্থা দেখিয়া গেলাম! বাবা! বাবা! তুমি ভাল মুখে একটি কথা কও। আমি তোমার এ ভাব আর দেখিতে পারি না।"

পিতৃভক্ত বালিকার আর কথা ফুটিল না।

শ্যামা ব্যাকুল হইয়া হীরালালকে কহিলেন, "হিরু! অবস্থা দেখিতেছ না? শীঘ্র ওঁকে এখান হইতে লইয়া যাও।"

হীরালাল অগত্যা, বলপূর্ব্বক যদুনাথকে সে স্থান হইতে লইয়া, নিম্ন তলে একটি কক্ষমধ্যে বদ্ধ করিয়া উপরে উঠিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন স্নেহের খুল্লতাত আসিতেছেন। তিনি কিছু বিরক্তির সহিত কহিলেন, "মহাশয়। এইরূপ ক্ষিপ্ত অবস্থায় আপনি কিরূপে পিসা মহাশয়কে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন?"

তিনি কহিলেন, "এখান হইতে এক ক্রোশ দূরে আমাদের নৌকা লাগান হইয়াছিল। সেখান হইতে দাদা, আমাদের অজ্ঞাতে কিরূপে যে এস্থানে উপস্থিত হইলেন, কিছুই বুঝিতে পারি নাই। তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে পদব্রজেই এখানে আসিয়াছি।"

হীরা। তিনি কতদিন অবধি এইরূপ ক্ষিপ্ত হইয়াছেন?

খুল্লতাত। স্নেহলতার বিবাহের কিছুদিন পর হইতেই একটু একটু মস্তিষ্কের গোলযোগ দেখা যায়। সেখানে অনেক চিকিৎসাদি করান হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমশঃ বৃদ্ধি ছাড়া কিছুতেই আরোগ্য না হওয়ায় এইখানে আনাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া আসিতেছিলাম।

হীরা। আচ্ছা। আপনি এক্ষণে হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করুন। আমরা বড় বিপদে আছি। স্নেহ ভারি পীড়িতা।

খুল্লতাত। সে জন্য আপনি ব্যস্ত হইবেন না। আমি আগে স্নেহকে দেখিয়া আসি।

এই বলিয়া তাঁহারা উভয়ে উপরে উঠিয়া গেলেন। পাগল একাকী সেই রুদ্ধ কক্ষে কখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে, কখন হাসিতে, কখন নাচিতে, কখনও বা গাহিতে লাগিল।

এ দিকে চিকিৎসকগণ, স্নেহলতার শরীরের অবস্থা দেখিয়া, নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিলেন। অকস্মাৎ তাঁহাদের মুখ একেবারে ম্লান হইয়া গেল। তাঁহারা গোপনে হীরালালকে রোগীর অবস্থা জানাইলেন। হীরালাল যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার আর দাঁড়াইয়া থাকিবার শক্তি রহিল না। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বজ্রাহতের ন্যায় স্নেহের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। বুদ্ধিমতী উষা অবস্থা বুঝিলেন।

উষা ধীরে ধীরে শ্যামার নিকট গিয়া কহিলেন, "পিসিমা, আপনি সরিয়া বসুন। স্নেহ অনেকক্ষণ খায় নাই, আমি স্নেহকে দুধ খাওয়াই।"

শ্যামা এতক্ষণ, আপনার অদৃষ্ট চিন্তা করিতে করিতে, জড়ের ন্যায় হতচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে উষাবতীর কথায় তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। তিনি সুপ্তোত্থিতার ন্যায়, ত্রস্ত দুগ্ধ-পাত্র হস্তে লইয়া, স্নেহের বদনে দিতে গলেন। কিন্তু হায়! কে আহার করিবে? এখন কি আর—মা বিশ্বজননীর অতি স্নেহের ধন—স্নেহলতার এই পাখীর আহারের প্রয়োজন আছে?

স্নেহ আপনার ক্ষুদ্র হস্ত দুখানি আপন বক্ষোপরি স্থাপন করিয়া গভীর ধ্যানে মগ্না। অমৃতদায়িনী জননীর প্রদত্ত অমৃত পান করিয়া

শান্তিলাভ করিতেছেন। স্নেহলতার ঈদৃশ ভাব দেখিয়া শ্যামা ক্ষিপ্তার ন্যায় বার-বার 'স্নেহ' 'স্নেহ' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই আকুল আহ্বানে স্নেহের প্রফুল্ল বদন ঈষৎ ম্লান হইল। স্নেহ, ধীরে ধীরে হস্ত উঠাইয়া, নীরব হইতে সঙ্কেত করিলেন। কিন্তু মায়ের প্রাণ কি ইহাতে স্থির থাকিতে পারে? শ্যামা অধিকতর ব্যাকুল হইয়া ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই হৃদয়ভেদী আহ্বানে, স্নেহ নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়া, ক্লেশমিশ্রিত ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "কেন ডাকিতেছ, মা?"

শ্যামা বিগলিতহৃদয়ে কহিলেন, "অনেকক্ষণ খাও নাই, মা! দুগ্ধ খাও।"

স্নেহ। খাইলে কি তুমি সুখী হও, মা?

শ্যামা। ও কি কথা! তুমি খাইলে আমি সুখী হই, তা কি আবার জিজ্ঞাসা করে?

এই বলিয়া অল্প দুগ্ধ স্নেহের মুখে দিলেন।

স্নেহ একবার মাত্র মুখে দিয়া কহিলেন, "আর না, মা!"

হীরালাল শ্যামাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রয়াস বৃথা হইল। শ্যামা আরও দৃঢ় হইয়া বসিলেন।

চিকিৎসকগণ, সময় উপস্থিত দেখিয়া, বিষণ্ণহৃদয়ে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে স্নেহলতার আকর্ণ-নয়ন-যুগল উজ্জ্বল হইতেও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। তাঁহার সেই সুচারু-বদনমণ্ডলে অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকাশিত হইল। সেই জ্যোতিপূর্ণ বদনমণ্ডলে কে

যেন আনন্দরাশি ঢালিয়া দিল। তিনি সকলের প্রতি একবার বিদায়সূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার সেই দৃষ্টির মর্ম্ম বুঝিয়া, উপস্থিত সকলের হৃদয়ই বিদীর্ণপ্রায় হইয়া গেল।

বালিকা তখন শ্যামার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "মা গো! এখন আমার বড় সুখের সময়, বড় শান্তির সময়। এখন আর কাঁদিও না, তাহা হইলে আমি কষ্ট পাইব। কান্না কিসের, মা? ধৈর্য্য ধর—নিষ্কামী হও। ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা কর, শান্তি পাইবে।"

স্নেহ ধীরে ধীরে অমৃতলালের একখানি হস্ত আপন ক্ষীণ হস্তে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার মুখের প্রতি চাহিলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র-ওষ্ঠ-দ্বয়ে সুধামাখা হাস্যের রেখা দিল। তাঁহার তৎকালিক মনোভাব অমৃতলাল বুঝিলেন এবং শূন্যপ্রাণে সেই সুধার ভাণ্ডার পবিত্র বদনের প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

হীরালাল ব্যাকুল হইয়া, স্নেহলতার নিষ্কলঙ্ক মুখকমলের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া, কি এক গভীরভাবে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার এখন আর কোন বাহ্য বস্তুর প্রতি লক্ষ্য নাই।

স্নেহ দাদার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "দাদা! চলিলাম। এখন একবার দয়াময় শ্রীহরির মহিমা কীর্ত্তন কর। বল, হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!"

ক্রমে স্নেহলতার সেই মনোহর নয়ন দুটি মুদ্রিত হইয়া আসিল। কি আশ্চর্য্য! চিরদিনের জন্য নয়ন মুদ্রিত করিয়াও স্বর্গের ছবি হাস্য-বদনে রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "মা! এখন তবে আমায় গ্রহণ কর"—এই বলিয়া, সেই হাস্যমাখা ক্ষুদ্র-ওষ্ঠদ্বয় চিরদিনের জন্য মুদ্রিত করিলেন।

যাও, সাধ্বি! জরা-মৃত্যু-দুঃখ-ক্লেশ-রহিত শান্তিময় স্থানে, অমৃতময়ীর অমৃত-ক্রোড়ে নির্ব্বিঘ্নে পরমসুখে বাস কর গিয়া। সেখানে লোকবিশেষের প্রভুত্ব নাই। সেখানে হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা, কুটিলতা, জঘন্য-প্রথা—প্রভৃতি কিছুই নাই। সেখানে দেবতাদিগের সহিত চিরসুখে তোমার মাতৃ-আজ্ঞা পালন কর গিয়া,—চির-আনন্দে তোমার চিরবাঞ্ছিত মায়ের অভয় চরণ পূজা কর গিয়া।

সকলই ফুরাইল। আর কি লিখিব? শ্যামার অবস্থা লিখিতে আর আমার ক্ষুদ্র দুর্ব্বল লেখনী আর সরে না। শ্যামার ন্যায় দুঃখিনী জননী যদি কেহ থাকেন, অনুভবেই বুঝিবেন।

'স্নেহলতা'-রচয়িত্রী-প্রণীত অন্যান্য পুস্তক ঃ—

প্রেমলতা

তৃতীয় সংস্করণ—উৎকৃষ্ট বাঁধাই।

মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা।

অমর ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

"প্রেমলতা" পাঠ করিয়া প্রেমাশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। নারীচরিত্র অঙ্কিত করিতে স্ত্রীলোকেরই সম্পূর্ণ অধিকার, লেখিকা এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যে পরিবার প্রেমলতার আদর্শে গঠিত হইবে, সে পরিবার সোণার সংসার হইবে। আমার বিবেচনায় গ্রন্থখানি যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে তাহার ত্রুটি হয় নাই। প্রত্যেক পরিবারে এক একখানি প্রেমলতা থাকা বাঞ্ছনীয়।"

মনস্বী ৺রাজনারায়ণ বসু—

"অনেক কাল হইল উপন্যাস পড়া একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। একে জগৎ অনিত্য, মিথ্যা। আবার মিথ্যার ভিতর মিথ্যা আনিয়া মোহগ্রস্ত হওয়া কেন? জীবনরূপ উপন্যাসের জ্বালায় অস্থির, তাহার উপর উপন্যাসের ভিতর উপন্যাস কেন?

*　　*

'প্রেমলতা' পাঠ করিয়া অপরিসীম সন্তোষ লাভ করিলাম। যে ব্যক্তি ইহা লিখিয়াছেন, তাঁহার অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগৎ বর্ণনা করিবার ক্ষমতা বিলক্ষণ এবং ধর্ম্মভাব প্রকৃত। গৈরিকবসনধারিণী সন্ন্যাসিনী প্রেমলতা কি মনোহর কল্পনা! তাঁহাকে ফুল দিয়া সাজানো যে কি উৎকৃষ্ট কল্পনা তাহা বলিতে পারি না। ঐ ছবি আমার মনে চির-মুদ্রিত থাকিবে। মরিয়া গেলেও যায় কিনা সন্দেহ। পুরুষ উপন্যাস-লেখক মাথা খুঁড়িলেও এমন কল্পনা বাহির করিতে পারিতেন না। এরূপ উপন্যাস কেতাদুরস্ত অনেক ধর্ম্মোপদেশ (sermon) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

'শকুন্তলা-তত্ত্ব'-প্রণেতা, চিন্তাশীল সমালোচক

চন্দ্রনাথ বসু—

"নারীই সংসার নষ্ট করেন; নারীই সংসার রক্ষা করেন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের নারীদিগকে এই গুরুতর কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু নারী দ্বারাই এই কথা কথিত হওয়া উচিত। কারণ সংসার রক্ষা নারীরই কাজ এবং নারীই নারীর উৎকৃষ্ট উপদেষ্টা। আমাদের নারীদের এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া 'প্রেমলতা'-রচয়িত্রী রমণীকুলের যে সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ কাজ তাহাই সম্পন্ন করিয়াছেন। রমণী এই মহৎ কাজে নিযুক্ত থাকিলেই সংসার রমণীয় হয়।"

আচার্য্য ৺সত্যব্রত সামশ্রমী—

"এরূপ নিত্য-প্রেমযুক্ত উপন্যাস এই নূতন দেখিলাম। বঙ্গভাষায় যদিও প্রেম শিক্ষার অনেক গ্রন্থ আছে, কিন্তু এরূপ গল্পচ্ছলে এরূপ প্রেম শিখাইবার পুস্তক একখানিও আছে কিনা সন্দেহস্থল; আমার বিবেচনায় ইহার দ্বারাই সে অভাব মোচন হইয়াছে। আমি বলি, কলিযুগের অন্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে, সেই হেতুই ঈদৃশ 'প্রেমলতা' দেখা দিয়াছে; এতাবতা এ আরব্ধ প্রেমযুগের সমুচিত আদর সমগ্রই ইহার প্রাপ্য।"

সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—

"প্রেমলতা" নামক পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ ও যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছি, এবং পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দ অনুভব করিয়াছি। গল্পটীতে প্রচুর রচনা-পারিপাট্য দৃষ্ট হয়, এবং ভাষা ও ভাবে যথেষ্ট মধুরতা আছে। * গ্রন্থখানি পাঠ করিতে করিতে মন যে অতি পবিত্র আনন্দময় ভাবপ্রবাহে প্লাবিত হয়, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।"

মহামহোপাধ্যায় ৺ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই,—

"প্রেমলতা" পাঠ করিয়া আমি পরম প্রীতি লাভ করিলাম। রচয়িত্রী ইহাতে অন্তর ও বহির্ভাব বিষয়ে অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ও অসাধারণ রচনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহার রচনা অতি সুন্দর

ও মনোহর—প্রাঞ্জল অথচ গাঢ়। রচনার উৎকর্ষ সম্বন্ধে এইমাত্র বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, স্থান বিশেষ পাঠ করিয়া চক্ষের জল বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমি এইরূপ কাব্যময় ধর্ম্মপ্রধান উপাখ্যান ইতিপূর্ব্বে কখনও পাঠ করি নাই।"

"বাঙ্গালা সাহিত্যে এই জাতীয় উপন্যাস যত অধিক প্রচারিত হইবে, যত অধিক পঠিত হইবে, দেশের ততই মঙ্গল। আমাদের বঙ্গ-মহিলাগণকে এই পুস্তক পাঠ করিতে আমরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।"

বসুমতী।

"রচয়িত্রী যিনিই হউন, তিনি সুলেখিকা বটে। আলোচ্য গ্রন্থে স্ত্রী-চরিত্রেরই প্রাদুর্ভাব। লেখিকা যে কয়টী চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সে কয়েকটীই কাব্যের সুষমাসার। আজ কাল অনেক রচয়িত্রী অনেক রকমেরই রচনা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু আমাদের মনে হয়, আলোচ্য গ্রন্থে রচয়িত্রীর রচনা, বহু অপাঠ্য রচনা পঠন জন্য অরুচিতে রোচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে কয়টী নারী-চিত্র এ গ্রন্থে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটী বড়ই বিচিত্র। এ চরিত্র আদর্শ হইতে পারে, কিন্তু সচরাচর দৃশ্য নহে। আর একটী রমণী-চরিত্র প্রকৃতই আদর্শ বটে, তবে, এ চরিত্র সচরাচর অদৃশ্য নহে। দুইটিই গীতা-ধর্ম্মের মর্ম্ম-বিগ্রহ। দুইটিই নিষ্কাম ধর্ম্মের মর্ম্ম প্রচারের জন্য একটি ধনাঢ্য গৃহস্থের গৃহে কুলবধূরূপে অবতীর্ণ। এই গৃহস্থের তিন কুলবধূ; উপরে যে দুইটীর কথা বলিলাম, তাহাদের মধ্যে একটী

প্রথম, অপরটী তৃতীয়। যিনি দ্বিতীয়, তিনি খলতায় ও স্বার্থপরতায় সংসার-সংহারিণী। বিলাসে তিনি বাঙ্গালিনী হইলেও বিবি। তিনি সংসার ছারখার করিয়াছিলেন। প্রথম কুলবধূ সর্ব্বাংশেই চরিত্র-মাহাত্ম্যে এবং তৃতীয় কুলবধূ বিশ্ব-প্রমোদী প্রেম-সৌন্দর্য্যে শ্মশান সংসারকে আবার সাজান বাগান করিয়া তুলিয়াছিলেন। তৃতীয় কুলবধূ সতী-শিরোমণি, কিন্তু পতির অনাস্থায় নিত্য মর্ম্মাহতা। এ মর্ম্মাঘাতে কিন্তু তাঁহার পাতিব্রত্য তিল মাত্র বিচ্যুত হয় নাই; পরন্তু তিনি সংসারের অনন্ত যাতনায় গৃহ-বিতাড়িত হইয়া প্রেমের সাধনায়—প্রেমে বিশ্ব জয় করিয়াছিলেন। প্রেমেই তিনি সন্ন্যাসিনী, প্রেমেই তিনি চৈতন্যরূপিণী। তাঁহারই প্রেমের মন্দাকিনী-প্রবাহে আবার মত্তমাতঙ্গিনী, গরবিণী, বিলাসিনী গৃহস্থের মধ্যম বধূ ভাসিয়া গিয়াছিলেন; তাঁহারই প্রেমে আবার সংসারে চৈতন্যের প্রেম জাগিয়াছিল। এ চরিত্র-চিত্রের অঙ্কনে কোথাও কোথাও কিছু অস্বাভাবিক বলিয়া আমাদের মনে হইলেও, এই রমণী এই সংসারক্ষেত্রে এক অপূর্ব্ব আদর্শ। বড় বধূর চরিত্রে অস্বাভাবিকত্বের লেশ মাত্র নাই। তিনি স্বভাবত নিষ্কাম ধর্ম্মের পূর্ণময়ী মূর্ত্তি। তিনি নিত্য দৈত্য-পদতল-নিপীড়িত সংসারের শত-জ্বালাময়ী জ্বালায় ঝলসিত, তবুও কিন্তু নির্ব্বাক নিশ্চল। সাধনায় রমণীরূপে বড় বউ প্রহ্লাদ, আর সেজ বউ ধ্রুব। ব্যথায় ধ্রুবের চরম সাধনা; আর প্রহ্লাদ স্বভাবেই সাধন-সিদ্ধ। মরি মরি! রচয়িত্রী কি চরিত্রই আঁকিয়াছেন!"

বঙ্গবাসী।

শান্তিলতা

মূল্য—১৲ এক টাকা, বিলাতী বাঁধাই—১।০ পাঁচ সিকা।

"এই শ্রেণীর উপন্যাস পাঠে নরনারীগণের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। ইহাতে গল্পচ্ছলে সংসার-নীতি, সমাজ-নীতি ও ধর্ম্মনীতির সার-গর্ভ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। সরল অথচ সাধু ভাষায়, রমণীয় অথচ গম্ভীরভাবে এই উপান্যাসখানি বিরচিত। রচয়িত্রীর কবি-প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় এই গ্রন্থে অভিব্যক্ত হইয়াছে।"

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা।

"আজ কাল দুই চারিটী রমণী-রচয়িত্রীর যে সব গ্রন্থ দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে শান্তিলতা একখানি উপাদেয় উপন্যাস। গার্হস্থ্যের সরল সৌন্দর্য্য, আবার বৈরাগ্যের গভীর গাম্ভীর্য্য, দুইটী মহান্ দৃশ্য রচয়িত্রীর লেখনী-তুলিকায় ভাষা-ভাবের আলোক-ছটায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাষা রচয়িত্রীর উপযোগিনী—কোমল ও সরল।"

বঙ্গবাসী।

"শান্তিলতা একখানি গল্পের পুস্তক। শ্রদ্ধেয়া রচয়িত্রী সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিতা; তাঁহার লেখা সকলেই পাঠ করিয়া থাকেন। শান্তিলতা তাঁহার যশ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। শান্তিলতার প্রতি পৃষ্ঠায় রচয়িত্রীর প্রগাঢ় ধর্ম্মভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এই পুস্তক খানি পাঠে বড়ই প্রীত হইয়াছি।"

বসুমতী।

"শান্তিলতা ধর্ম্ম ও শিল্পমূলক উপন্যাস। ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত 'স্নেহলতা' ও 'প্রেমলতা' সাহিত্য-জগতে রচয়িত্রীর যথেষ্ট সুখ্যাতি স্থাপিত করিয়াছে, আলোচ্য পুস্তক দ্বারা তাহা আরও বর্দ্ধিত হইল। আমরা এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত পাঠে পরম সুখলাভ করিয়াছি।"

সময়।

লুৎফ উন্নিসা

সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১৷০ পাঁচসিকা।

"লুৎফ-উন্নিসা" রচয়িত্রীর পূর্ব্বযশঃ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। লুৎফ-উন্নিসা রমণীরত্ন; * এই পুস্তকে শ্রদ্ধেয় লেখিকা মহোদয়া অতি সুন্দরভাবে সিরাজ-চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। তাঁহার যত্ন সফল হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করা শেষ হইলে মহাত্মা বেভারিজের সেই সুন্দর কথাটাই বলিতে ইচ্ছা করে। "Sirajuddowla was more unfortunate than wicked."—বসুমতী।

"এই লুৎফ-উন্নিসা তাঁহার অন্যান্য পুস্তক অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি সিরাজের ও লুৎফ-উন্নিসার চরিত্র যে ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আমরা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। তিনি প্রতি পৃষ্ঠায়ই ভাষার চাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্রী যে সাধ্যমত ইতিহাসের সম্মানও রক্ষা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে কম প্রশংসার কথা নহে।"—সময়।

প্রসূনাঞ্জলি

মূল্য ।/০ পাঁচ আনা ; বিলাতী বাঁধাই—৷৷০ আট আনা ।

মহামহোপাধ্যায় ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই,—

"লেখিকা ভূমিকাতে যাহাই লিখুন, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও ভাষাজ্ঞান যে সামান্য নহে, তাহা এই পুস্তক পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। স্ত্রীলোকের এইরূপ দুরূহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া কৃতকার্য্য হওয়ায় আমি সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম।"

কবিবর ৺নবীনচন্দ্র সেন—

"রোগশয্যায় শুইয়া পড়িতে পড়িতে দুই ঘণ্টাকাল যে পতি-প্রেম ও বিশ্বপতি-প্রেমের উচ্ছ্বাসে হৃদয় পবিত্র হইয়াছিল, তাহার জন্য গ্রন্থকর্ত্রীর কাছে আমি কৃতজ্ঞতা মাত্র প্রকাশ করিতে পারি। অন্য কোনও মত প্রকাশ করা আমার মত দাসত্ব-নিষ্পেষিত কঠোর-প্রাণ ব্যক্তির পক্ষে অসাধ্য।"

'We have no doubt but that not only her own sex, but also the other sex, will profit immensely by a study of the essays which she has composed with so much skill and feeling"—The Indian Mirror.

প্রকাশক—শ্রীরাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
১৫ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কলিকাতা।

পরিশিষ্ট।

সবই ফুরাইয়াছে। ছয় মাস অবধি শ্যামা শয্যাগতা। শ্যামার ক্লেশের কথা বর্ণনাতীত। শ্যামা পূর্ণাহার করেন না, লোকালয়ে মুখ দেখান না।

হীরালাল অনেক সময় শ্যামার কাছে বসিয়া থাকেন। শ্যামা কাঁদিলেই, অধীর হইলেই, "কান্না কিসের, মা? ধৈর্য্য ধর—নিষ্কামী হও। ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা কর, শান্তি পাইবে," স্নেহের এই মহামূল্য শেষ উপদেশ স্মরণ করাইয়া, শ্যামার সন্তপ্ত প্রাণে সান্ত্বনা দেন। তবুও শ্যামা থাকিয়া থাকিয়া যেন শিহরিয়া উঠেন, প্রাণ হু-হু করিয়া উঠে। স্মৃতির সহায়ে স্নেহলতার অমিয়-মাখা মূর্ত্তি, অমিয় ভাব, অমিয় বাক্যাবলিই শ্যামার এখন একমাত্র অবলম্বন।

হীরালালের প্রাণপণ যত্নে ও ডাক্তারদিগের সুচিকিৎসায় যদুনাথ ক্রমে সুস্থ হইলেন।

হীরালালের নিকট সমুদয় বিষয়-সম্পত্তির ভার বুঝাইয়া দিয়া, সস্ত্রীক চুনিলাল, যদুনাথ ও শ্যামাকে লইয়া, হরিদ্বারে গিয়া সাধন-ভজনে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

হীরালাল সপরিবারে, গুরুজনের চরণ-দর্শন-মানসে, মধ্যে মধ্যে হরিদ্বারে গমন করেন। তিনি অতি যত্নে সুশীলকুমার এবং মোহিনীকে স্বগৃহে আনিয়া উৎসাহের সহিত সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন।

উষার সন্তানাদি হয় নাই। মোহিনীর মনোহর পুষ্পের মত দুটি পুত্র ও একটি কন্যা হইয়াছে। উষা, অতি যত্নে সন্তান-নির্ব্বিশেষে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া, পরমানন্দ লাভ করিতেছেন। উষার প্রেম, স্রোতস্বতী নদীর ন্যায় সংসার-মরুক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়া, পৃথিবীকে সরস করিতেছে। উষা চিন্তা করেন, "এমন মনোহর জগতে পাপ-তাপ কেন? দুঃখ-অশান্তি কেন? ঘৃণা-বিদ্বেষ কেন? মলিনতা, কুটিলতা, স্বার্থপরতা, দাম্ভিকতা কেন? উষা ভাবেন, এত হাহাকার-নিরানন্দই বা কেন? এত অপ্রেমই বা কিসের? বিশ্বজয়ী প্রেমে তো সব পরাভূত হয়!" উষার কোমল উদার হৃদয় সংসারের এই দুর্ব্যবহার আর সহিতে পারে না। উষা সদাই চিন্তা করেন, "মানুষ আপনাকে আপনি চিনিল না!" উষার মন পরহিতচিন্তনে রত, উষার নয়নদুটি পরসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, উষার জিহ্বা পরগুণকীর্ত্তনে উন্মুক্ত। উষার কর্ণ পীড়িতের মর্ম্ম-কথা শুনিতে ব্যস্ত, উষার হৃদয়খানি দেবতার সিংহাসন। উষার হস্ত দুইখানি রোগীর সেবায়, তাপিতের অশ্রু মুছাইতে, দুঃখীকে দান করিতে, ক্ষুধিতকে অন্ন দিতে—জগতের সকল মহৎ কার্য্যে সদা প্রবৃত্ত। উষার চরণ দুখানি সকল সৎকার্য্যে সদাই পরিচালিত। গ্রামস্থ ধনী ও দরিদ্র, জ্ঞানী ও মূর্খ, সাধু ও অসাধু, আবালবৃদ্ধবনিতা, সকলেই উষার মধুময় প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, দেবী-নির্ব্বিশেষে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসাইয়া, তাঁহাকে পূজা করে।

আর মোহিনী? মোহিনী শান্ত শিষ্ট সুবোধ মেয়ে। দিদি যা বলে তাই শুনে, যা করায় তাই করে, দিদির পদচিহ্নে পদবিক্ষেপ করে, দিদির বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া বেড়ায়।

হীরালাল ও সুশীলকুমার, বিশ্বপতির চরণে মস্তক রাখিয়া, উষার সহায়ে ধর্ম্মকর্ম্মে সংসারকার্য্যে নিরত।

* * * * *

সংসারের অধিকাংশ মানব ঘটনায় পরিচালিত। মানব ঘটনাক্রমে সুপথে চলিতেছে, আবার ঘটনাক্রমেই বিপথে গমন করিতেছে। তাই আজ আমরা দেখিতেছি, ঘটনাস্রোতে ভাসিয়া, যদুনাথ ধর্ম্ম-পিপাসু হইয়া ব্যাকুল অন্তরে নির্জ্জন-গিরিগহ্বরে ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছেন। সেখানে ধর্ম্মাত্মা সাধুদিগের নিকট ধর্ম্মের গুহ্য বিষয় একাগ্রচিত্তে শ্রবণপূর্ব্বক তৎসাধনে দৃঢ়সংকল্প করিতেছেন।

যদুনাথ সর্ব্বদা ভাবেন, "আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই?" যদুনাথের হৃদয় দিবা-রজনী অনুতাপে দগ্ধ হইতেছে। একদিন যদুনাথ কাতরচিত্তে পর্ব্বতারণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক দূরে গিয়া লতাগুল্মে আচ্ছাদিত একটা গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এক যুবক সন্ন্যাসী গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। সন্ন্যাসীর বদনমণ্ডলে স্বর্গীয় জ্যোতি বিভাসিত হইতেছে। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া যদুনাথের সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল, "দেব! ক্ষমা কর, রক্ষা কর—পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাও" বলিয়া, যদুনাথ, ছিন্নমূল তরুর ন্যায়, সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে পতিত হইলেন!

সন্ন্যাসীর নিমীলিত-নয়নদ্বয় উন্মীলিত হইল। সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান হইয়া, করজোড়ে ও উর্দ্ধনেত্রে, জানি না যদুনাথকে কি দেখাইয়া দিলেন। জানি না যদুনাথও বিভোরচিত্তে করজোড়ে ও উর্দ্ধনেত্রে কি দেখিতে লাগিলেন! কিয়ৎক্ষণ পরে যদুনাথ চতুর্দ্দিকে চাহিয়া

দেখিলেন, সন্ন্যাসী আর সে স্থানে নাই। যদুনাথ তিন দিন, অনাহারে, অনিদ্রায়, অরণ্যে অরণ্যে, গুহায় গুহায়, কাতরচিত্তে সন্ন্যাসীকে অনেক খুঁজিয়াছিলেন। কিন্তু অনেক খুঁজিয়াও আর সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পান নাই।

*　　*　　*　　*　　*

বেলা অবসান হইয়াছে। মোহিনী আপন কক্ষে বসিয়া জাহ্নবী-সুন্দরীর নয়নতৃপ্তিকর মধুর মূর্ত্তি দেখিতেছেন, আর কত কি ভাবিতেছেন। তাঁহার কোমল হৃদয় অনেক সময়ই পিতা, মাতা ভ্রাতার শোকে অধীর হইয়া পড়িত। দশ বৎসর হইল, পিতা-মাতার মৃত্যু হইয়াছে। সেই অবধি প্রাণের দাদা, উদাসহৃদয়ে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। পিতা-মাতার অপার স্নেহ স্মরণ করিয়া মোহিনী আজ কাঁদিয়া ফেলিলেন। তার পর অমৃতলালের স্মৃতি আসিয়া তাঁহার পুষ্প-কোমল হৃদয় অধিকার করিল। দাদার গভীর ভালবাসার কথা যতই মোহিনীর হৃদয়-পটে উদিত হইতে লাগিল, ততই অশ্রুস্রোতে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। উবার প্রেমে মোহিনী কাঁদিতেও সময় পান না। আজ মোহিনী নির্জ্জনে বসিয়া অনেক কাঁদিলেন। মোহিনী হৃদয়ের আবেগে বলিতে লাগিলেন, "দাদা! দাদা! দাদা গো! তুমি কোথায়? তুমি কি এজগতে নাই? একবার কি আমায় দেখা দিবে না?"

মোহিনীর এক বৎসরের গোলাপের মত মেয়ে, সুধা, মেজে বসিয়া খেলা করিতেছিল। সে মাতার কথা শুনিয়া, মধুমাখা আধস্বরে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র চারিটি দাঁত বাহির করিয়া, নির্ম্মলাননে স্বর্গের শোভা

প্রকাশিত করিয়া, মধুর হাস্য করিয়া উঠিল। মোহিনীর প্রাণ আজ ইহাতে মোহিত হইল না। মোহিনী আজ দাদার কথা ভাবিতে ভাবিতে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। মোহিনী একবার সম্মুখস্থ রাজপথে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, সহসা উচ্চকণ্ঠে "দাদা! দাদা! বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সুধা মাতার এই অবস্থা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। উষা, বালিকার চীৎকার শুনিয়া, সত্বর সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন এবং মোহিনীকে তদবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া, ত্রস্তভাবে তাঁহার মুখে জলসেচন ও ব্যজন করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে বাড়ীর সকলেই জানিতে পারিল, ছোট বৌঠাকুরুণ মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন। একজন দাসী তখনি কাঁদিতে কাঁদিতে বহির্ব্বাটীতে হীরালাল ও সুশীলকুমারকে এই সংবাদ জানাইল। তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া, সত্বর মোহিনীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই মোহিনীর চৈতন্যোদয় হইল।

মোহিনী কাতরস্বরে সুশীলকুমারকে কহিলেন, "আমার দাদা এই রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছেন—তুমি শীঘ্র গিয়া তাঁহাকে লইয়া এস।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে, হীরালাল এবং সুশীলকুমার শীঘ্র অমৃতলালের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

মোহিনী কহিতে লাগিলেন, "দাদার পরিধানে গেরুয়া কাপড়, মস্তকে লম্বিত জটা। দাদা আমার নবীন বয়সে সন্ন্যাসী হইয়াছেন!"

বহুক্ষণ অন্বেষণের পর হীরালাল ও সুশীলকুমার প্রত্যাগমন করিয়া কহিলেন, "কোথাও তাঁহাকে বা তাঁহার সদৃশ কোন সন্ন্যাসীকে খুঁজিয়া পাইলাম না।"

মোহিনী কাঁদিতে লাগিলেন। সকলে তাঁহাকে নানা প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

সেই সময় হইতে সময়ে সময়ে, নগরে ও গ্রামে, এক অপূর্ব্ব নিষ্কামী সন্ন্যাসীকে পরহিতব্রতে নিরত দেখা যাইত।

সমাপ্ত।